২৩ জানুয়ারি ১৯৮৫ □ আনন্দবাজার প্রকাশন □ তিন টাকা

আনন্দমেলা

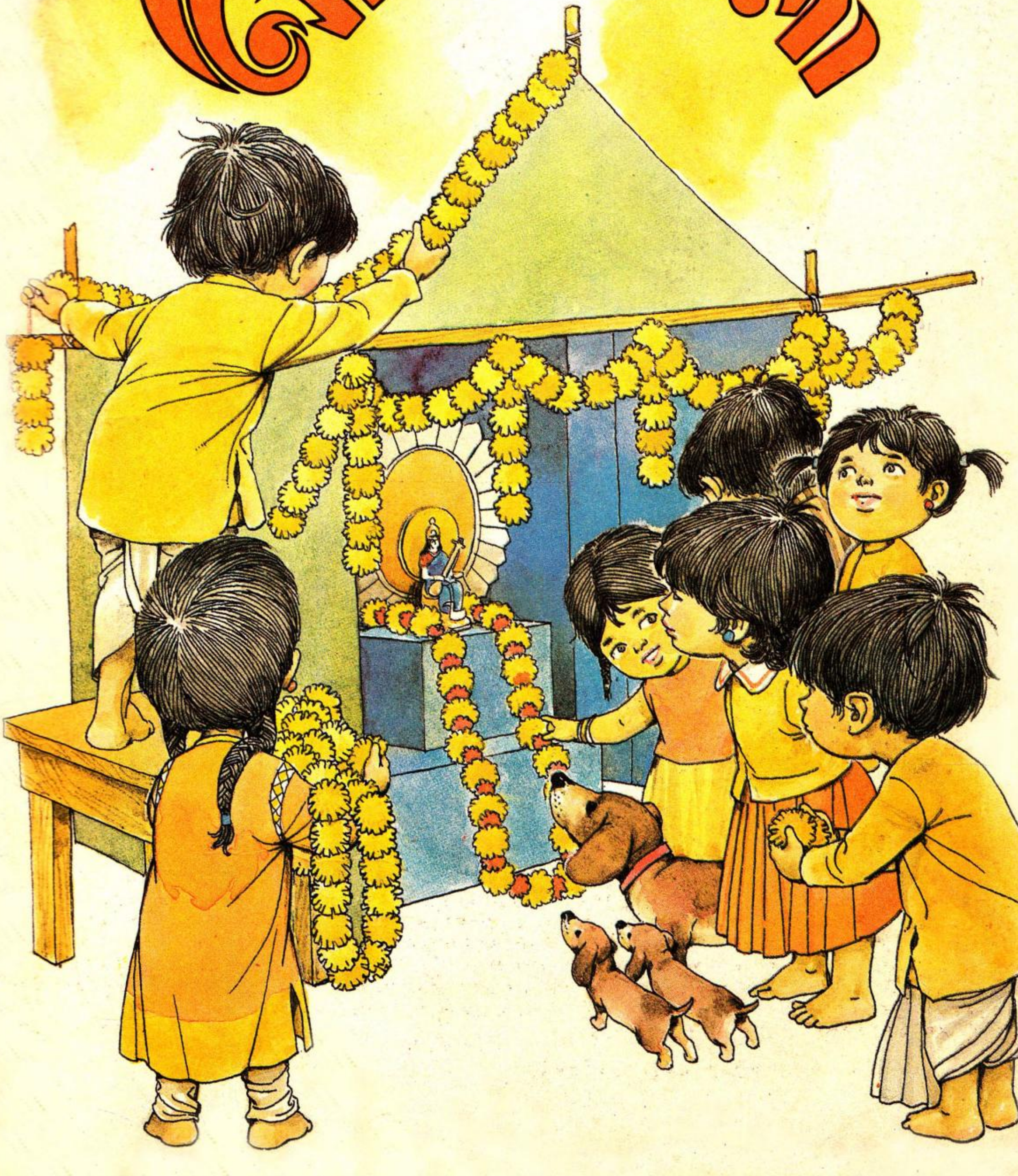

বেশী সুস্বাদু
বেশী সম্পূর্ণ

মায়ের মত মমতায় ভরা প্রত্যেকটি চামচ আপনার বাড়ন্ত শিশুর শরীর বৃদ্ধির জন্য একান্ত উপকারী।

দুধযুক্ত ফ্যারেক্স শক্ত আহার।

এটি মেশানো একদম সোজা। এটি খাওয়ানো একেবারে সহজ। প্রোটিনে ভরপুর বলেই শিশুর বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত দরকারী।
বাড়তি আয়রন রক্তকে সুস্থ রাখবার জন্য।
সঠিক অনুপাতে ক্যালসিয়াম ও ফস্‌ফরাস দাঁত ও হাড় আরো মজবুত করবার জন্য।
শিশুর কোমল হজমশক্তির উপযোগী করে আগেই রান্না করে রাখা হয়েছে।

দুধযুক্ত ফ্যারেক্স শক্ত আহার।
আরো সম্পূর্ণ শক্ত আহার।

স্বাস্থ্যের উৎস—গ্ল্যাক্সো

CLARION/B/GX/4/244 BEN

বিনামূল্যে! শিশুর প্রথম বছরের খাতার জন্যে, পোস্টেজ ও অন্যান্য খরচ বাবদ ১ টাকার স্ট্যাম্পসমেত লিখুন: পোঃ বঃ নং **19119** বোম্বাই (FCM-3) **400 025**

৯ মাঘ ১৩৯১ □ ২৩ জানুয়ারি ১৯৮৫ □ ১০ বর্ষ ১৫ সংখ্যা

বড় গল্প
বাকোর ঘুড়ি । সমীর মুখোপাধ্যায় ৩৭
গল্প
জীবনকালীর পাকা হিসেব । আশাপূর্ণা দেবী ৯
অভ্রদীপের কারসাজি । রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায় ১৫
চোর ধরা । বিমান রাউত ৩৩
কুয়াশায় নোটন । সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৫
সতেরো ঘোড়সওয়ারের ভূত । স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৫
সম্পূর্ণ চিত্রকাহিনী
সাহসী ভাইবোন ২৫
বিশেষ রচনা
বনফুলের শেষ সৌরভ । যুগল সেন ৫
বাচ্চা-বাঘিনী ডোরা । রতনলাল ব্রহ্মচারী ৩৫
ধারাবাহিক উপন্যাস
গোলমাল । শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ২২
কালো পর্দার ওদিকে । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ২৮
বিজ্ঞানবিচিত্রা
এলাম আমি কোথা থেকে । সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৭
জেনে নাও । অরূপরতন ভট্টাচার্য ২৪
শার্লক হোম্‌সের গল্প
ওষ্ঠবক্র রহস্য । অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন ৫২
লেখাপড়া
অর্থ জানো (অবিমৃশ্যকারী) । দেব-সেনাপতি ৪৪
সহজে ইংরেজি (পাতালে কয়েক মিনিট) । প্রসাদ ৪৪
কবিতা ও ছড়া
ছুটিতে । রাখাল বিশ্বাস ৫১
ভৌত খবর । মৃণালকান্তি দাশ ৫১
ডাক্তারি । পুণ্ডরীক চক্রবর্তী ৫১
খেলাধুলো
ইডেনে ক্রিকেট খুন । রাজা গুপ্ত ৬২
জয়ের রথ রুখে দিল অস্ট্রেলিয়া । সম্রাট রায় ৬৩
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ পর্যুদস্ত । শ্যামসুন্দর ঘোষ ৬৫
বাংলার ক্রিকেটে বিসর্জনের বাজনা । অশোক রায় ৬৬
চিত্রকাহিনী ও কমিক্‌স
টিনটিন ২০, রোভার্সের রয় ৩০, টারজান ৩৬
সদাশিব ৪৮, গাবলু ৬১
অন্যান্য আকর্ষণ
তোমাদের পাতা ৪৯, ধাঁধা ৫৮, শব্দসন্ধান ৫৮
মজার খেলা ৫৯, হাসিখুশি ৫৯

প্রচ্ছদ : বিমল দাস

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দাম তিন টাকা। বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১০ পয়সা ; উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১৫ পয়সা। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

আগামী সংখ্যায় (৬ ফেব্রুয়ারি)

বিমল করের

বিজ্ঞানভিত্তিক সম্পূর্ণ রহস্যোপন্যাস

একদিন এক গোলাপবাগানে

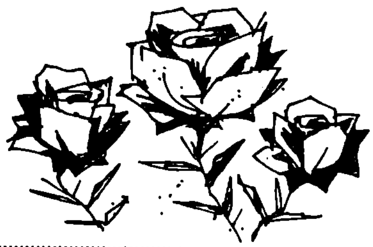

তারাপদ রায়ের

মন-মাতানো মজার গল্প

টমসাহেব

মীরা বালসুব্রমনিয়নের

তাক-লাগানো গোয়েন্দা-কাহিনী

প্রবলেম সলভার পুল্লা রেড্ডি

আরও অজস্র আকর্ষণ

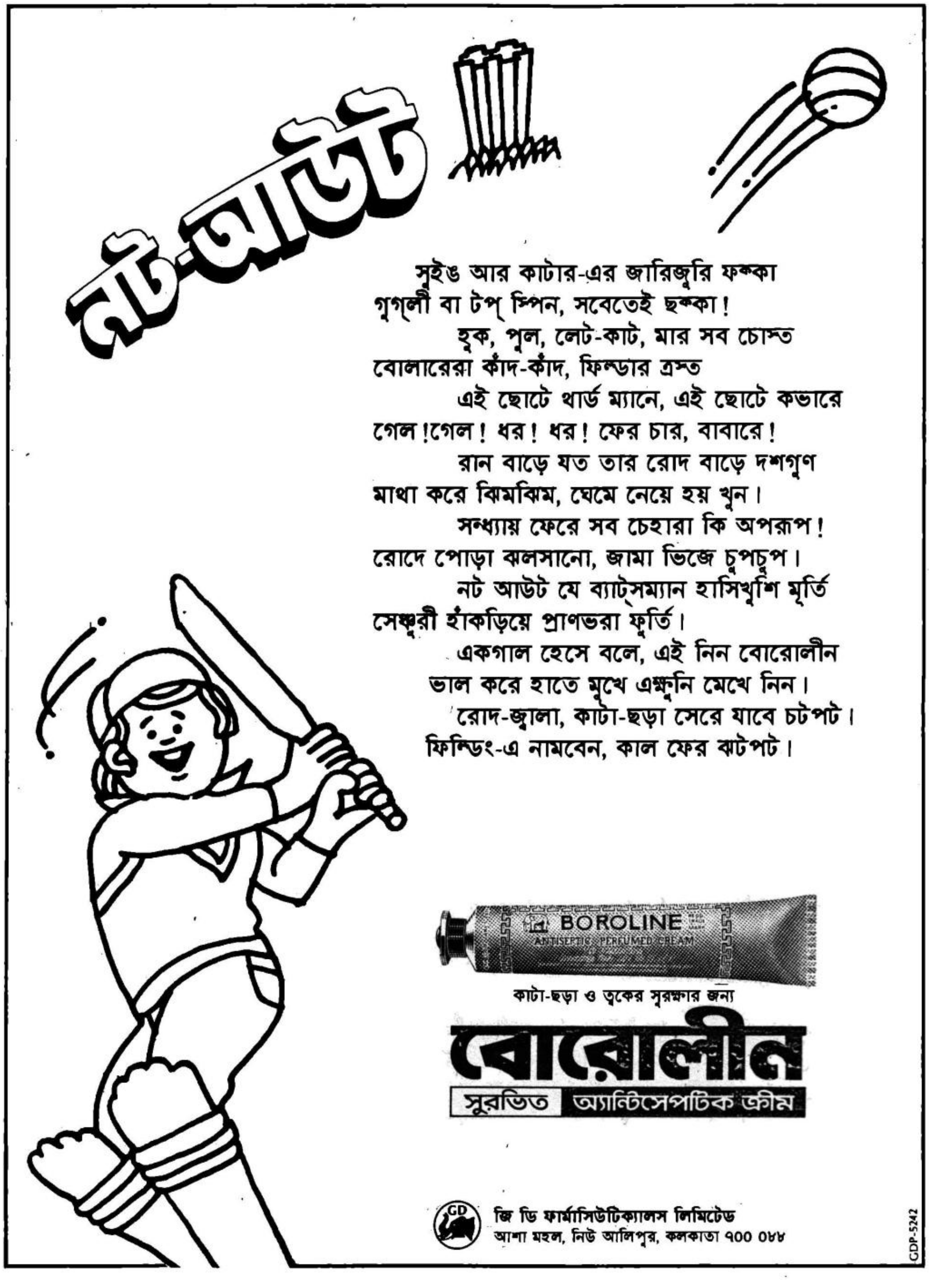

নট-আউট
সুইঙ আর কাটার-এর জারিজুরি ফক্কা
গুগ্লী বা টপ্ স্পিন, সবেতেই ছক্কা!
হুক, পুল, লেট-কাট, মার সব চোস্ত
বোলারেরা কাঁদ-কাঁদ, ফিল্ডার ত্রস্ত
এই ছোটে থার্ড ম্যানে, এই ছোটে কভারে
গেল!গেল! ধর! ধর! ফের চার, বাবারে!
রান বাড়ে যত তার রোদ বাড়ে দশগুণ
মাথা করে ঝিমঝিম, ঘেমে নেয়ে হয় খুন।
সন্ধ্যায় ফেরে সব চেহারা কি অপরূপ!
রোদে পোড়া ঝলসানো, জামা ভিজে চুপচুপ।
নট আউট যে ব্যাট্সম্যান হাসিখুশি মূর্তি
সেঞ্চুরী হাঁকড়িয়ে প্রাণভরা ফূর্তি।
একগাল হেসে বলে, এই নিন বোরোলীন
ভাল করে হাতে মুখে এক্ষুনি মেখে নিন।
রোদ-জ্বালা, কাটা-ছড়া সেরে যাবে চটপট।
ফিল্ডিং-এ নামবেন, কাল ফের ঝটপট।
BOROLINE
ANTISEPTIC PERFUMED CREAM
কাটা-ছড়া ও ত্বকের সুরক্ষার জন্য
বোরোলীন
সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম
GD
জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড
আশা মহল, নিউ আলিপুর, কলকাতা ৭০০ ০৮৮
GDP-5242

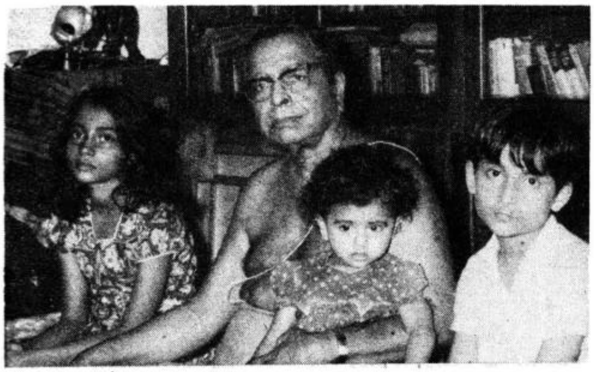

বনফুল (নাতি-নাতনিদের সঙ্গে)

বনফুলের শেষ সৌরভ

যুগল সেন

বনফুলের নাম তোমরা শুনেছ। তাঁর আসল নাম বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। গল্প ও উপন্যাসের লেখক হিসেবেই তাঁর খ্যাতি বেশি বটে, তবে কবি হিসেবেও তিনি ছিলেন অসামান্য শক্তির অধিকারী। যেমন বড়দের জন্যে, তেমনি ছোটদের জন্যেও তিনি অনেক লিখেছেন। বনফুল বলতেন, ছোটদের জন্যে 'এমনভাবে লিখতে হবে, যাতে তাদের কল্পনাশক্তি বাড়ে।'

বনফুলের প্রথম রচনা 'ময়ূর' নামে একটি কবিতা। আশ্চর্য এই যে, তাঁর শেষ রচনাও একটি কবিতা। তাঁর এই শেষ রচনার পাণ্ডুলিপিটি সংগ্রহ করার পিছনে ছোট্ট একটু ইতিহাস আছে। তাঁর মৃত্যুর দশদিন আগে দুপুরবেলায় তাঁকে বলেছিলাম, "কাল সরস্বতী পুজো। এখানে সরস্বতী পুজো করেন না কেন?"

শুনে তিনি হেসে বললেন, "কেন, রোজই তো পুজো করি।"

সারা জীবন যিনি সাহিত্যসাধক, আলাদা করে পুজো করবার দরকার যে তাঁর হয় না, এই সহজ কথাটাই আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

বনফুল বললেন, "ছেলেবেলায় আমি একবার সরস্বতীর স্বপ্ন দেখেছিলাম। এটা কোথাও লিখিনি। জনাকয়েক বন্ধু মিলে ঠিক করেছিলাম, সরস্বতী পুজোর জন্যে যবের শিষ আনব। বাড়ির কাছেই জমি ছিল, চাষ হত। খুব ভোরবেলায় উঠতে হবে। কথা হল, বন্ধুরা এসে আমায় ডাকবে। তারা কিন্তু ডাকতে আসেনি। ভোর হবার আগেই আমি একা বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে। বাড়ির সামনে আমবাগান। সেই বাগানে ঢুকে একটা সুর শুনতে পাই। অদ্ভুত সুর। কোত্থেকে ভেসে আসছে, বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ চোখে পড়ল, আমবাগানের উপরের আকাশে একটা তেকোনা আলো। নীচ থেকে উপরে উঠছে আলোটা। দেখলাম, সেটা একটা মুকুট। আরও দেখলাম, মুকুট-মাথায় মা সরস্বতী, তাঁর হাতে বীণা, সেই বীণার সুর ভেসে আসছে। ··· সবটাই অবশ্য স্বপ্ন।"

বললাম, "সরস্বতী সম্পর্কে আমাকে একটা কবিতা লিখে দিন।"

প্যাড টেনে তক্ষুনি যে কবিতাটি তিনি লিখেছিলেন, এখানে সেটি ছাপা হল।

কবিতার নীচে তিনি তারিখ দিয়েছিলেন 'শ্রীপঞ্চমী ১৩৮৫'। সেইসঙ্গে লিখে দিয়েছিলেন, "শ্রীমান যুগলকে দিলাম।"

আশ্চর্য, পরদিন শ্রীপঞ্চমীর সকালেই বনফুল অসুস্থ হয়ে পড়েন। আর সুস্থ হয়ে ওঠেননি।

তোমারই সৌরভ

সর্বশুক্লা তুমি রূপবতী
পদ্মাসনা দেবী সরস্বতী,
　　আমি ক্ষুদ্র অতি
তবু তুমি আমার প্রণতি
　　নিয়েছ চরণে,
বিকশিত করেছ তা অসংখ্য বরণে।
তোমারি মহিমা তাহা
　　তোমারি গৌরব
সুদূর-প্রসারী তাহা
　　তোমারই সৌরভ।
　　ক্ষুদ্র এ প্রণাম
ধন্য তাই, বহি তব মহত্ত্বের নাম।

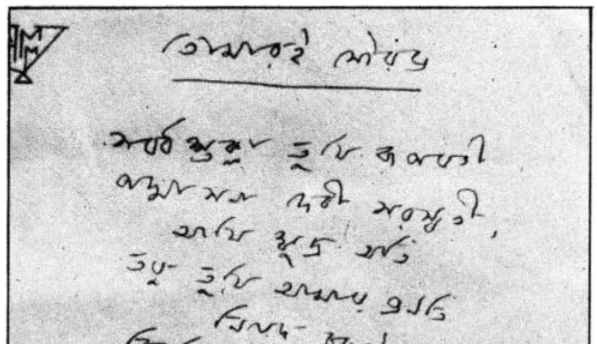

তোমারই সৌরভ

সর্বশুক্লা তুমি রূপবতী
পদ্মাসনা দেবী সরস্বতী,
আমি ক্ষুদ্র অতি
তবু তুমি আমার প্রণতি
নিয়েছ চরণে,
বিকশিত করেছ তা অসংখ্য বরণে।
তোমারি মহিমা তাহা
তোমারি গৌরব
সুদূর-প্রসারী তাহা
তোমারই সৌরভ।
ক্ষুদ্র এ প্রণাম
ধন্য তাই, বহি তব মহত্ত্বের নাম।

শ্রীপঞ্চমী
১৩৮৫
বনফুল

শ্রীমান যুগলকে দিলাম।

প্রতিটি সুইট খাসা দারুণ মজায় ঠাসা!
বড় আকার!
খেতেও বড় মজাদার!
নিউট্রিন
SuperStar
সেরা টফি চমৎকার
nutrine SuperStar DELITE
nutrine SuperStar TWINTREAT
nutrine SuperStar TOPCREAM
টুইন ট্রিট
ডিলাইট
টপ ক্রীম
স্বর্গীয় আনন্দ!
nutrine ভারতের সবচেয়ে বেশী বিক্রীর সুইট
নিউট্রিন কনফেকশানারী কোং প্রাঃ লিঃ, চিত্তুর, অ. প্র.

কোথায় গেল ডাইনোসর

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

কোথায় গেল সেইসব দৈত্যকায় ডাইনোসর ? আর গায়ে লম্বা-লম্বা লোমওয়ালা গণ্ডার ? কিংবা খড়্গের মতো দাঁতওয়ালা সেই বাঘ ? আর ম্যামথ নামের অতিকায় সেই হাতি ? সে-ই কবে তারা সব মরে ভূত হয়ে গেছে। এখন তাদের পাওয়া যায় শুধু বিজ্ঞাননির্ভর কল্পিত ছবিতে, কিংবা জাদুঘরে রাখা শিলীভূত হাড়গোড়ের নিদর্শনে।

কোথায় গেল সেই রাক্ষুসে পর্ণাঙ্গ বা ফার্ন ? চওড়া-চওড়া পাতাওয়ালা সেইসব চিরহরিৎ উদ্ভিদ ?

তাদের জায়গা নিয়েছে নতুন জাতের সব জীবজানোয়ার, আর নতুন-নতুন জাতের গাছপালা। পুরনোর গর্ভে হয়েছে কত নতুনের উদ্ভব।

দুনিয়া এক থাকে না। নিয়ত বদলায়। কিছু বদল চোখের ওপর ঘটে। ফুটন্ত জল বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। বরফ গলে জল হয়। কুঁড়ি থেকে হয় ফুল, ফুল থেকে ফল। তা-দেওয়া ডিম ফুটে ছানা হয়, সেই ছানা আস্তে আস্তে বড় হয়। যে ছেলেটা সেদিন হামা দিত, সে দেখি আজ দিব্যি হেঁটে বেড়াচ্ছে।

পৃথিবীর চেহারাও পাল্টে যায়। হয় উৎস শুকিয়ে মজে যায় নদী, নয় পলি পড়ে-পড়ে বদ্‌লে যায় তার খাত। মাটিকে গ্রাস করে মরুভূমি। জল আর হাওয়ার দৌরাত্ম্যে উঁচু-উঁচু পাহাড়ও খয়ে গিয়ে ছোট হয়। কখনও শতসহস্র, কখনও লক্ষকোটি বছর লেগে যায় পৃথিবীর এই ভোলবদল হতে।

জলহাওয়ারও বদল হয়। কোথাও বা আগের মতো তেমন শীত পড়ে না, কোথাও বা খরা বাড়ছে। বুড়োরা নালিশ করে বলে, 'ঋতুগুলো আর আগের মতো থাকছে না।' এর মধ্যে কিছু থাকে মনগড়া, কিছু সত্যি।

উদ্ভিদ আর প্রাণিজগতেই পরিবর্তনগুলো বেশি ঠাহর করা যায়। ছিল বীজ, হয়ে গেল খেতভর্তি ধান। ছিল বিচ্ছিরি দেখতে শুঁয়োপোকা, হয়ে গেল সুন্দর রংচঙে প্রজাপতি। ছিল গুঁড়ি-গুঁড়ি ব্যাঙাচি, ল্যাজ খসে হয়ে গেল গোদা-গোদা পা-সুদ্ধ কোলা ব্যাং। এমনি কত কী !

আবার অনেক রকম বদল আছে, যা খালি চোখে দেখাই যায় না। বৈজ্ঞানিকেরা জোরালো যন্ত্রপাতি দিয়ে সে-সব নজরে আনেন। যে-জিনিস তবু দেখা যায় না, তাও তাঁরা ঠারেঠোরে আঁচ করে নেন। **(ক্রমশ)**

ব্রিটানিয়া দুধ বিস্কুট
বাড়ন্ত বাচ্চার সুস্বাদু সাথী!
Milk Bikis
BRITANNIA
Milk Bikis
সুস্বাদু পুষ্টিকর বিস্কুট
ব্রিটানিয়া

"এর মানে ?…ভেবেছেন কী ?…পাগল পেয়েছেন আমায় ?"

জীবনকালীর পাকা হিসেব

আশাপূর্ণা দেবী

"জীবনকালী ডাক্তারের বাড়ি চেনো ?" বলতেই রিকশাওলা একগাল হেসে বলল, "চিনি বই কী ! এ-তল্লাটে কোন্ রেসকোওলাটা ওনার বাড়ি না চেনে !"

তারাপদর হাতের অ্যাটাচিকেসটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে রিকশার সিটের একধারে ঠেকিয়ে রেখে রিকশাওলা আত্মস্থ গলায় বলল, "নিন, উঠুন ! বসেন জুত করে।"

মনে-মনে একটু আরামের নিশ্বাস ফেলে জুত করেই বসলেন তারাপদ। যাক বাবা, নিশ্চিন্দি। এখন গদিতে সমাসীন হয়ে হাত-পা এলিয়ে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে পল্লীশোভা দেখতে-দেখতে এগিয়ে যাওয়া।

যদিও মফস্বল তবুও জায়গাটা রীতিমতই একটি 'টাউন'। কিন্তু কলকাতার চিরবাসিন্দাদের কাছে মফস্বল মানেই পাড়াগাঁ। বহু চেষ্টাই তো করলেন তারাপদ এতদিন, কলকাতায় তো হল না কিছু। অগত্যাই মফস্বলে আসতে হচ্ছে !

যাক, শচীন ঠিকই বলেছে, "বাড়ি খুঁজে পাবার ব্যাপারে চিন্তার কিছু নেই তারুদা, মফস্বলে রিকশাওলারাই গাইড !

তা মফস্বল হলেও যেতে-যেতে বেশ ভালই লাগছে। বেলা দশটায় রোদটা চড়ে উঠেছে বটে, তবে রাস্তাটা তো কলকাতার রাস্তার মতন মরুভূমিসদৃশ নয়, মাঝে-মাঝেই বেশ ছায়া-ছায়া। রাস্তার দু'ধারে বড়-বড় সব গাছ। আর রিকশাওলাটা যেন বাতাসে পাখনা মেলে উড়ে চলেছে। চলবে না কেন, এমন সুন্দর ফাঁকা রাস্তা পেয়েছে।

চলতে-চলতেই রিকশাওলাটার সঙ্গে জমাতে চেষ্টা করলেন তারাপদ।

"ডাক্তারের বাড় অনেক দূর না কি ?"

"আজ্ঞে, তা কিঞ্চিৎ দূর আছে !"

কথার বাহারে মনে-মনে হাসলেন তারাপদ। তারপর বললেন, "রাস্তাটা তো বেশ চমৎকার পিচের, লোকজন তেমন দেখছি না তো !"

হাওয়ার উল্টোমুখে কথা, তবু উত্তরটা বুঝতে পারলেন তারাপদ। ছুটির দিন, কোর্টকাছারি ইস্কুল কলেজ সব বন্ধ, তাই !

তাও তো বটে ! তারাপদকে তো ছুটির দিনেই আসতে হয়েছে। যাক, লোকটার কাছ থেকে কিছু তথ্য জেনে নেওয়া যেতে পারে।

নড়েচড়ে বসলেন তারাপদ।

"ডাক্তারবাবু লোক কেমন ?"

"আজ্ঞে মানুষ না।"

"অ্যাঁ ! কী বললে ?"

"ঠিকই বলছি বাবু, মানুষ না, দেবতা। গরিবের মা-বাপ।"

স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল একটা। তবু রক্ষে ! বলে কিনা 'মানুষ না' !

তবে 'গরিবের মা-বাপ' শুনে মনে-মনে একটু হাসলেন তারাপদ। তা হবে হয়তো। কিন্তু না-গরিবের ? থাক, সেটা না বলাই ভাল। বলতে গেলেই তো বলতে হবে তাদের 'যম'।

তারাপদ আর-একটু জেনে নিতে বললেন, "ছেলেমেয়ে ক'টি ওনার ?"

"ছেলে তো ওই একটিই মাত্তর ! হিরের টুকরো ছেলে। আপনি জানেন না ? ভাবছিলুম আপনার আত্মীয় !"

"না, আত্মীয় নয় ঠিক। পরিচয় হয়েছে, এই আর কী !"

"বুঝেছি।"

রিকশাওলা একটু ব্যঙ্গের গলায় বলল, "তো এমন চেনা-পরিচিত তো হরদমই আসছে ডাক্তারবাবুর কাছে। বিনি পয়সায় চিকিচ্ছে করাতে রেলভাড়া খরচা করেও আসছে। তো আপনার ব্যামোটা কী ? দেখে তো মনে হচ্ছে না···কোনো···"

রাগে গা জ্বলে গেল তারাপদর। ব্যাটা তুই ভেবেছিস কী ? আমি তারাপদ বোস রেলভাড়া খরচা করে তোদের জেবনকালীর কাছে বিনে পয়সায় চিকিৎসা করাতে এসেছি !

কিন্তু মুখে তো আর ওই 'ব্যাটা-ফ্যাটা' বলা যায় না, তাই গম্ভীর হয়ে বললেন, "ব্যামো শক্ত।"

"তা হোক, আপনি ভাববেন না বাবু। কত কত দুরোরোগ্য রোগ সারাচ্ছেন উনি। তো কলকাতা থেকে আসা হয়েছে বুঝি ? ওখেনে ব্যামো সারল না ?"

আবার রাগ আসে। নাঃ, দেখছি যেচে কথা কওয়াটাই ভুল হয়েছে। বিরক্তি চেপে কথা ঘোরালেন তারাপদ, "আর কতক্ষণ ?"

"আজ্ঞে আর একটুক আছে।"

তারাপদ মনে মনে বললেন, শচীন বলেছিল স্টেশন থেকে খুব বেশি দূর নয় ! আর তুমি ব্যাটা বেশি ভাড়া তোলবার জন্যে আমায় সারা টাউনটি ঘোরাচ্ছ ! যেমন অন্য কোনোখানে নতুন গিয়ে পড়া যাত্রীদের ঘোরায় সেখানকার ট্যাক্সি ড্রাইভাররা ! যাক ! একসময় তো থামবে !

তা অবশ্য থামল !

একটা বিশাল বাগানওয়ালা ছবি-ছবি চেহারার সুন্দর দোতলা বাড়ির গেটের সামনে ঝনাত করে রিকশা থামিয়ে ফেলে লোকটা বলে উঠল, "এই যে এসে গেছি। এই বাড়ি !"

এই বাড়ি !

দেখে তারাপদ হাঁ ! এই এতবড় বিশাল সুন্দর বাগান-ঘেরা বাড়ি শচীনের মামাতো ভগ্নিপতি জীবনকালীর ! কই, এতটা তো বলেনি শচীন। সারপ্রাইজ দিতে বোধহয়। তা এত বোল-বোলাও মফস্বল জায়গা বলেই বোধহয়। এসব জায়গার লোক-টোক কবরেজি হোমিওপ্যাথি এই সবই ভজে বেশি। আর এ-লোকটা যে অর্থপিশাচ, তা তো জানাই হয়ে গেছে তারাপদর !

যাই হোক, বাড়িটা দেখে যেমন ভালও লাগল তেমনি একটু ভয়-ভয়ও করল। অবশ্য বেশ ভাল ধুতি-পাঞ্জাবি পরেই এসেছেন তারাপদ, আর চেহারাটিও তাঁর নেহাত ফেলনা নয়। তবু নিচু-নিচু হয়েই আসা তো ! যদি বলে-কয়ে দাবিটা কিছু কমাতে পারেন। সবই তো চিঠিপত্রে ঠিক হয়েছে, চাক্ষুষ দেখাটেখা হয়নি এখনও। কে জানে কেমন লোক।

শচীনটাও যে কূলে এসে তরী ডোবাল। সঙ্গে আসবে বলে কথা দিয়ে কাল হঠাৎ বলে গেল দারুণ কী এক কাজ পড়ে গেছে !

"কই, বাবু, আমায় মিটিয়ে দিন !"

"ও হ্যাঁ। কত দিতে হবে ?"

"যা আপনার বিবেচনা !"

"আমার বিবেচনায় কী হবে ? বিবেচনাটা তো তোমার !"

"আজ্ঞে তিনটে টাকা দিয়ে দিন।"

শুনে তো তারাপদ হাঁ। ভেবেছিলেন আট-দশটাকাই বা চেয়ে বসে। হৃষ্টমনে টাকাটি দিয়ে গেট ঠেলে ঢুকলেন। রিকশাওলাটা একটা হাঁক পাড়ল, "ডাক্তারবাবু ! লোক এসেছে !"

"কে রে ? গগন নাকি ?" বলে বেরিয়ে এলেন এক দীর্ঘকায় ব্যক্তি সুট-ফুট পরা। বেরোবেন মনে হয়।

গগন বলল, "এই যে এনাকে ইস্টিশান থেকে আনলুম।"

"তুমি তো ব্যাটা ওই করতেই আছ।"

একটু হেসে তারাপদকে বললেন, "আসুন।"

তারাপদ এলেন। ঘরে বসলেন।

বাঃ, দিব্যি সাজানো-গোছানো ঘরটি তো ! 'মফস্বল' বলে করুণা করার মতো নয়।

সোফায় ডুবে বসে তারাপদ বললেন, "আমি তারাপদ বোস। আহেরিটোলা থেকে আসছি।"

"আরে ! বোস ইনস্টিটিউটের তো ? আপনি নিজেই··· ছি ছি, দেখুন তো কী অন্যায়। আজই আমি চিঠিটা ড্রপ করছিলাম। নাঃ, ভেরি ব্যাড ! মানে আমারই অন্যায় !"

তারাপদ এতক্ষণে ফুরসত পেয়ে বললেন, "আজ্ঞে, আমি কোনো ইনস্টিটিউটের নই ! আমি মানে শচীনের বন্ধু !"

"শচীনের বন্ধু ! শচীন ? কোন্ শচীন ? রোগা, কালো, দাঁত উঁচু ?"

"না তো ! বেশ হেলদি, ফর্সা, ইয়ে, দাঁত-টাঁতও তো···"

"বুঝেছি ! ভুঁদো শচীন !"

"আজ্ঞে না না, তেমন কিছু না ! এমনি মাঝারি ! আপনার কীরকম যেন শালা হয়।"

"শালা ! আমার শালা হয় ?" হা হা করে ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠলেন জীবনকালী, "তাই বলেছে বুঝি ? তো এ যুগে মশাই সব ব্যাটাই শালা হয়ে পড়ে। যাক, আপনার আসার উদ্দেশ্য ?"

"উদ্দেশ্য···মানে আমার মেয়েটিকে একবার দেখবেন কথা আছে···"

"কথা আছে নাকি ? কী মুশকিল ! কখন যে কাকে কী কথা দিয়ে বসি ! তো এনেছেন মেয়েকে ?"

মেয়েকে এনে দেখাতে হবে ? বলে কী ! রাগে মাথা জ্বলে গেল তারাপদর। টাকার গরমে ধরাকে সরা দেখছেন সাহেব।

রাগ চেপে বললেন, "মেয়েকে আর আনব কী করে ? আপনাকেই একবার গিয়ে দেখতে হবে !"

"গিয়ে কোথায় ? কোন পাড়ায় ?"

"আজ্ঞে কলকাতায়। আহিরিটোলায়।"

জীবনকালী প্রায় ছিটকে উঠলেন, "কলকাতায় গিয়ে দেখা ? কিছু মনে করবেন না, অসম্ভব ! আমার পক্ষে অসম্ভব। বলে মরবার সময় নেই !"

তারাপদ সাহসে ভর করে বলেন, "তা ছবি অবশ্য পাঠিয়েছি আগে···কিন্তু···"

"ছবি ? কিসের ছবি ?" জীবনকালী আকাশ থেকে পড়েন, "আপনি তো মশাই বেশ তাজ্জব-করা কথা বলতে পারেন ? কবে আবার ছবি-টবি পাঠালেন।"

তারাপদ বুঝে ফেলেছেন, লোকটা ভীষণ ভুলো। তাই নম্র গলায় বলেন, "আপনি ব্যস্ত মানুষ, হয়তো মনে নেই. তা আর-একটা ছবি আমি এনেছি।"

অ্যাটাচি খুলে সন্তর্পণে একখানি রঙিন ফোটো বার করেন তারাপদ। হাসি-হাসি মুখ একটি উজ্জ্বল চেহারার কিশোরী ! আগে কালো-সাদা ফোটো পাঠিয়েছিলেন, এবারে একটা রঙিন ফোটো তুলিয়ে এনেছেন !"

"এই যে আমার মেয়ের ছবি।"

তারাপদর মুখে আহ্লাদের আলো। এ-ছবিটি দেখলে আর দেখতে হবে না।

কিন্তু জীবনকালীর যে তারাপদর জীবন কালি করবার চেষ্টা !

ছবিখানা হাতে না-নিয়েই বলে ওঠেন, "এ-ছবি দেখে আমি কী করব ? এরকম আঁকা-ভুরু, রং-করা-ঠোঁট মেয়ের ছবি তো হরদমই দেখছি বিজ্ঞাপনে-টিজ্ঞাপনে। মেয়ের এক্স-রে ফোটো আনেননি ? মানে, হার্টের বা লাংসের, ঘাড়ের কি পেটের ? মানে···"

বটে ! এক্স-রে ফোটো ! তারাপদর এখন রাগে শুধু মাথাই জ্বলে না, সমস্ত লোমকূপসুদ্ধু জ্বলে ওঠে ! মেয়ের এক্স-রে ছবি দেখাতে হবে ? ভেবেছে কী লোকটা ! নাকি পাগল-টাগল নয় তো ? ভগবান জানেন হতেও পারে।

নাঃ, একটা সুস্থ মাথার লোকের সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার। কোথায় সেই নদের চাঁদ হিরের টুকরো ছেলেটি! তাকে একবার খুকুর ছবিটা দেখাতে পারলে...

ভেতরের জ্বলুনি চেপে বলে ওঠেন তারাপদ, "আজ্ঞে, ওসব লাগবে জানা ছিল না তো। তা যাক, এসেছি যখন, আপনার ছেলেটিকে একবার দেখে যেতাম!"

"আমার ছেলেকে! আপনি? কেন বলুন তো মশাই? আপনিও ডাক্তার নাকি? আমার ছেলেই একটা পেশেন্ট?"

"কী মুশকিল! পেশেন্টের কথা তুলছেন কেন? রাতদিন পেশেন্ট আর এক্স-রে ফোটো করে-করে! কিন্তু আপনার হোমিওপ্যাথিতে তো এসব এক্স-রে করার কথা নয়।"

"কী? কী বললেন? হোমিওপ্যাথি?" আবার ঘরফাটানো হাসি। "হোমিওপ্যাথি!" হাসি থামতেই চায় না!

"ওঃ! তাই বলুন! কেসটা আপনার মেয়ের নয়, আপনার নিজের! ঠিক আছে। এখনই আপনাকে একটা ডোজ দিয়ে দিচ্ছি, ঘুমোন পড়ে পড়ে ঘণ্টা-কয়েক। ঘুরে এসে দেখব ভাল করে।"

সঙ্গে-সঙ্গেই দেয়ালের ধারে রাখা একটা আলমারি থেকে একপাতা ট্যাবলেট বার করে, তা থেকে একটা ট্যাবলেট ছিঁড়ে নিয়ে বলেন, "নিন, খেয়ে ফেলুন।... অবনী, এক গ্লাস জল আন তো! নিন, ধরুন!"

"এর মানে?" তারাপদ এখন ডানলোপিলোর আরাম থেকে ছিটকে উঠে চেঁচিয়ে বলেন, "আপনার এখানে ঘুমের বড়ি খেয়ে আমায় পড়ে-পড়ে ঘুমোতে হবে? ভেবেছেন কী আপনি? পাগল পেয়েছেন আমায়?"

"কিছু মনে করবেন না দাদা। তা পেয়েছি একটু-একটু। একটু নয়, বেশ বেশিই! তবে আমার কাছে এটা তেমন কোনো প্রবলেমই নয়! অবশ্য 'সময়' লাগবে।"

গেঞ্জি পায়জামা পরা এক ছোকরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটা কাঁচের গ্লাসে জল নিয়ে এল।

জীবনকালী-ডাক্তার দৃঢ়ভাবে বললেন, "নিন, খেয়ে ফেলুন ট্যাবলেটটা।"

অবনী জল এগিয়ে দিল।

"খান! খান বলছি! এখন আপনার এটা খুব দরকার!"

"বটে? খুব দরকার!" তারাপদ তেড়ে উঠে বললেন, "এখন আমার খুব দরকার এই পাগলের বাড়ি থেকে চম্পট দেওয়া।"

বলেই দরজার দিকে এগোতে যান।

কিন্তু ততক্ষণে অবনীর প্রতি ইশারা হয়ে গেছে, এবং অবনী সুকৌশলে দরজা আটকে ফেলে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

বটে! তারাপদ বুঝে ফেলেন, বেশ একখানি বদলোকের পাল্লায় পড়ে গেছেন। কে জানে, ওই রিকশাওলা গগন ওঁর চর কিনা! স্টেশন থেকে লোককে ভুলিয়ে এখানে নিয়ে এসে কেটে পড়ে, আর ইনি তাকে ঘুমের বড়ি খাইয়ে কব্জা করে ফেলে ভগবান জানেন কী করেন! আচ্ছা, আমিও তারাপদ বোস! হতে পারি মেয়ের বাবা; এবং খোসামোদ-টোসামোদ করে পনের টাকাটা একটু কমাবার তাল ভাঁজছিলাম, তা বলে এত বোকা নই যে, এই গাড্ডায় পড়ে বসব!...আচ্ছা... গিয়ে শচীনকে নিচ্ছি একহাত!

"জলটা নিন, বাবু!"

কী অমায়িক গলা ছোকরার! আহা, রোসো, দেখাচ্ছি মজা!

'নিচ্ছি' বলেই তারাপদ দিলেন এক ধাক্কা! ব্যস, সঙ্গে-সঙ্গে যা হবার তা-ই! কিন্তু দরজা ছাড়ল না অবনী, কারণ কর্তার সঙ্গে ইশারা চলছে।

কিন্তু কাঁচ ভাঙার ঝনঝনানি শুনে বাড়ির গিন্নি ছুটে না এসে পারেন? হাঁসফাঁস করতে-করতে ছুটেই এলেন গিন্নি চেঁচাতে চেঁচাতে, "ভাঙলি তো গেলাসটা? অমন সুন্দর নতুন

Trikaya-GP-10.84-BEN

গেলাসটা ? এই নিয়ে এ-মাসে ক'টা হল অবনী ? এক ডজন থেকে গোটা তিনেক পড়ে আছে বোধহয়।"

বলতে-বলতে ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালেন গিন্নি !

কী ব্যাপার ?

অবনী একবার তারাপদর দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে অলক্ষ্যে নিজের মাথায় হাতটা বোলাল।

গিন্নির ভুরু কুঁচকে গেল।

কিন্তু তারাপদর ?

মাথার চুল খাড়া হয়ে গেল না ? অবনীর ওই 'অলক্ষিত' ভঙ্গি তাঁর লক্ষিত হয়নি ?

"বটে ! বটে ! আমি পাগল ? তা দেখুন ম্যাডাম, আমাকে ডাক্তারবাবু যত কাঁচা ছেলে ভেবেছেন, তত কাঁচা নই আমি।"

"ব্যাস ! ব্যাস ! একেবারে মিলে যাচ্ছে !" বিড়বিড় করে বলেন জীবনকালী, "এ-লোককে কোনো প্রিকশান না নিয়ে একা পথে ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয় !" এরপর উচ্চগ্রামে বলেন, "ঠিক আছে, জল না খান, একটু চা তো খাবেন ? কষ্ট করে কলকাতা থেকে এসেছেন !"

কলকাতা থেকে ! জীবনকালী-গিন্নির বুকটা ছলাত করে ওঠে। কলকাতা থেকে কেউ এসেছে শুনলেই তাকে তাঁর আপনজন মনে হয়। যতই হোক, বাপের বাড়ি বলে কথা। বললেন, "কোথা থেকে এসেছেন ?"

"ওই যে বাঙালিটোলা না বেনেটোলা না কলুটোলা না কসাইটোলা..."

"থামুন তো !" তারাপদ প্রায় ধমকে ওঠেন।

আর ভয় কিসের ? মেয়ের বিয়ে তো আর দিচ্ছেন না এখানে।

"আহিরিটোলাটা আর কিছুতেই মনে আসছে না ?"

"আহিরিটোলা ! অ্যাঁ !" চেঁচিয়ে ওঠেন গিন্নি, "সেজপিসির বাড়ি যে গো ওখানে ! শঙ্কর বোসকে চেনেন ?"

যদিও কস্মিন কালেও চেনেন না তারাপদ, তবু অবলীলায় বলেন, "ওঁকে আর কে না চেনে ও-পাড়ায় ?"

ডাক্তারগিন্নি একগাল হেসে বলেন, "আমার পিসেমশাই ! ওরে অবনী, শিগগির চায়ের জল চড়াগে ! আর ঘরে যা-যা আছে, ভাল করে গুছিয়ে সাজাগে। দ্যাখো তো কাণ্ড, আহিরিটোলা থেকে এসেছেন ভদ্রলোক, আর শুধু এক গেলাস জল ধরে দিচ্ছিলে তাঁকে ? ছি ছি !"

তারাপদ বঙ্কিমহাস্যে বলেন, "শুধু জল বললে অবিচার করা হবে ডাক্তারবাবুর ওপর ! জলের সঙ্গে একটি খুব দামি ট্যাবলেটও দিচ্ছিলেন !"

"ট্যাবলেট ! ওমা ! ট্যাবলেট আবার কিসের ?"

"ওঁকেই জিজ্ঞেস করুন।"

আহিরিটোলার ভাইঝি কপাল কুঁচকে বলেন, "কী ট্যাবলেট ?"

"সে তুমি বুঝবে না !"

"তাই তো, আমি তো কিছুই বুঝি না। যত বোঝে তোমার অবনী ! তো আপনি, দাদা, এনার কাছে কেন এসেছিলেন ?"

জীবনকালী তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, "ওই যে অন্য কিছু না ! শুধু কলকাতায় গিয়ে ওঁর মেয়েটিকে একবার দেখে আসতে !"

ডাক্তারগিন্নি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁসফাসাচ্ছেন, আর পারলেন না ! ডানলোপিলোর গহ্বর খুঁড়ে গদাম করে বসে পড়ে বলে উঠলেন, "কলকাতায় গিয়ে দেখে আসতে হবে ? কেন ? কলকাতায় কিসের অভাব ? কী হয়েছে মেয়ের ?"

তারাপদ উষ্মাভরে বলেন, "আর কিছুই না, শুধু বিয়ের বয়েস হয়েছে।"

"ও, হ্যাঁ হ্যাঁ।" জীবনকালী টেবিল চাপড়ালেন, 'মনে পড়েছে, বিয়ের বয়েস হয়েছে, অথচ হার্ট খারাপ।"

"হার্ট খারাপ ?"

তারাপদ চোখ পাকিয়ে বলেন, "বলেছি আমি এ-কথা ?"

"না না, হার্ট নয়, ইয়েস, লাংস। লাংস। ওইজন্যেই তো বলছিলাম এক্স-রে ফোটোটা দেখা দরকার। তো..."

"দেখুন ডাক্তারবাবু, ক্রমেই ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে আমার। বলেছি আমি আমার মেয়ের লাংসের দোষ হয়েছে ? বলুন, কখন বলেছি ?"

"আই অ্যাম সরি। ইয়ে ইয়ে গঙ্গাধরবাবু..."

"গঙ্গাধর ?"

"ওঃ নো। মাপ করবেন, গদাইপদবাবু।"

"ফের ? ফের যা-তা বলছেন ? কেন, আকাশের তারা দেখেন না ? নয় তো 'মা গো তারা' বলেন না ? তারাপদ নাম শোনেননি কখনো ?"

"এই দেখুন ? শুনব না কেন ? তারাপদ, এই তো ? আপনি মশাই বড্ড রাগী। হবেনই তো। অথচ ট্রিটমেণ্ট করাতে রাজি নন।"

"ও মা। শোনো কথা।" জীবনকালী-গিন্নি কর্তার এই হাড়কালি-করা কথায় একটু ঝঙ্কার দিয়ে বলে ওঠেন, "হচ্ছিল ওনার মেয়ের কথা..."

জীবনকালী উদারগলায় বলেন, "আহা, সেটা কি আমি ভুলে গেছি ? মেয়ের ব্যাধিটি হচ্ছে, বিয়ের বয়েস হয়েছে মেয়ের, অথচ বাড়বৃদ্ধি নেই।"

"বাড়বৃদ্ধি নেই ?" তারাপদ প্রায় নেচে ওঠেন, "বাড়বৃদ্ধি না থাকলে বাপকে এমন ছুটিয়ে মারায় ?"

"ছুটিয়ে মারায় ?" আহিরিটোলার ভাইঝি ভয়ে-ভয়ে বলেন, "ছুটিয়ে মারায় ?"

"তাছাড়া আর কী ? নইলে কী দরকার ছিল আমার পয়সা আর সময় খরচা করে পাগলের পাল্লায় পড়তে আসি ? এই তো দেখুন না।"

ফট্ করে পকেট থেকে একটু আগে রাখা ফোটোটা বার করে ডাক্তারগিন্নির নাকের সামনে ধরে দেন, "বাড়বৃদ্ধি নেই এই মেয়ের ?"

ডাক্তারগিন্নি ছবিখানা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে বলে ওঠেন, "ও মা, এ যে বড় খাসা মেয়ে গো ! কী লাবণ্য, কী মুখখানি ! তা এ-মেয়েকে ডাক্তার দেখাতে চান কেন ভাই ?"

আহিরিটোলার ছেলেকে 'ভাই' বলবেন না-ই বা কেন ? পিসির ছেলেদের বয়সীই তো !

'ভাই' শুনে তারাপদ একটু নরম হলেন। নিশ্বাস ফেলে বললেন, "কেন আর ! কপাল ! ডাক্তারের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করে মরেছিলাম, তাই !"

"মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলেন ?"

জীবনকালী তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। বললেন, "তবে যে বললেন, মেয়েকে একবার দেখতে হবে।"

"হ্যাঁ, বলেছিই তো ! ছেলের বিয়ে দিতে হলে মেয়েটাকে দেখতে হয় না ?"

জীবনকালীও এখন বসে পড়ে বলেন, "মেয়ে দেখা ! তার মানে কনে দেখা ! তা সে-কথা আগে বলবেন তো ?"

"বলবার আর স্কোপ পেলাম কই ?"

তারাপদ হতাশভাবে বললেন, "আপনি মেয়ের এক্স-রে ফোটো চেয়ে বসলেন !"

"এ হে হে ! দেখুন তো কাণ্ড। তা আসার আগে জানাবেন তো ?"

"জানিয়েছি বই কী ডাক্তারবাবু !" তারাপদ এখন বেপরোয়া, বেশ কড়া গলায় বলেন, "চিঠিপত্র তো চলছেই কিছুদিন থেকে !

কুড়ি হাজারের কম কিছুতেই রাজি হচ্ছেন না দেখে ভাবলাম, নিজে এসে যদি বুঝিয়ে সুঝিয়ে কিছু কমাতে পারি।”

জীবনকালী বসে ছিলেন, আবার উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, “কুড়ি হাজার! কী কুড়ি হাজার? কিসের কুড়ি হাজার! কাদের কুড়ি হাজার?” ধাপে-ধাপে গলা চড়ে ডাক্তারের, “কেন কুড়ি হাজার! মানে কী কুড়ি হাজারের?”

তারাপদ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, “আমিও তো তাই ভাবছি। মানে কী?”

জীবনকালী সন্দেহ-সন্দেহ গলায় বলেন, “আপনি বলছেন চিঠিপত্র চলেছে। কিন্তু আমি তো কিছুই মনে করতে পারছি না। হ্যাঁ গো, তুমি কিছু জানো?”

জীবনগিন্নি তখনও হাসি-হাসি মুখে একমনে সেই রঙিন ফোটোখানি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখেই চলেছেন! ঘরের কোনো কথাই শুনতে পাননি। এখন বললেন, “কী জানব?”

“এই যে ইনি কী যেন কিনবেন বলে দর-টর করছিলেন, আমি নাকি কমাতে রাজি হইনি।”

“কী কিনবেন?” মহিলা বলেন।

তারাপদ বিনীতভাবে বলেন, “আজ্ঞে কিনব না কিছুই, শুধু মেয়েটিকে দান করব। তারই দক্ষিণা তো ডাক্তারবাবু আপনিই লিখেছিলেন, কুড়ি হাজারের কমে হবে না। এই তো দেখুন না চিঠি। আপনারই লেখা।” বলে ফস করে একটা চিঠিও বার করে ফেলেন তারাপদ।

এখন জীবনকালীর নাচের পালা।

“কী? এই কালিমাখা, কাঁকড়াবিছে হেঁটে যাওয়ার মতো হাতের লেখা আমার? ভাবতে পারলেন কী করে? অ্যাঁ! ঠিকানা তো দেখছি সেই খালপারের ‘হোমিও জেবনকালীর’! সকালবেলা যার নাম করলে হাঁড়ি ফাটে। লোকটা নাকি ছেলের বিয়ের টাকায় বিজনেস করার তালে আছে। নাম করলে আর ফাটবে না হাঁড়ি?”

তারাপদ হতভম্ব হয়ে বলেন, “এখানে আরও জীবনকালী আছেন?”

“থাকবে না কেন? একনামে দু'জন লোক থাকে না? আপনার ওই নেবুতলায় না না আইসক্রিমতলায় আর-কোনো গঙ্গাপদ আছে কিনা জানেন আপনি?”

তারাপদ আর তাঁর নাম-ঠিকানার ভুলের কারেকশান করার চেষ্টা করেন না, হাল ছেড়ে দিয়ে বলেন, “এইরকম লোক?”

“সেই তো কথা! ওর সেই বি. এ. ফেল ছেলেটার সঙ্গে আপনি আপনার ওই পরির মতন মেয়েটির বিয়ের সম্বন্ধ করছিলেন? এর পরেও আপনার মাথার চিকিৎসা করার দরকার নেই বলতে চান? তবে কার দরকার? আমার? অবনী, সেই থেকে এক গ্লাস জল আনতে বলছি না? আন শিগগির! নিন মশাই, ট্যাবলেটটা ধরুন। অবনী রে।”

জল আনে অবনী। ট্রেতে সাজিয়ে তার সঙ্গে চা এবং বহুবিধ ‘টা’। মায়ের পিসির পাড়ার লোকের জন্যে কতটা কী সমারোহ দরকার, তা জানা আছে অবনীর!

তারাপদ থতমত খান। “এসব কী? এসব কী?”

জীবনকালী বলেন, “কিছু না, কিছু না। একটু ভালমন্দ খাবার-দাবার।”

“এত কেন?”

জীবনকালী উদার গলায় বলেন, “এত আর কী? কিছুই তো নয়। আপনি ওনার পিসির পাড়ার লোক! খবর দিয়ে এলে আরও কত পেতেন! খান, খেয়ে নিন।”

জীবনগিন্নিও আহ্লাদে-ভাসা গলায় বলেন, “হ্যাঁ ভাই, খেয়ে নিন। এই ছানার মালপো আমার ঘরের গোরুর দুধের, নিজের হাতে তৈরি। আর এই রসমাধুরী বাজারের সেরা দোকানের। দুপুরের ভাতটি কিন্তু খেয়ে যেতে হবে আপনাকে।”

জীবনকালী আরও দরাজ গলায় বলেন, “হ্যাঁ হ্যাঁ, খেয়ে যাবেন। একটু আগে মাংস সেদ্ধর গন্ধ পাচ্ছিলাম। তবে যা খান আর তা খান, ট্যাবলেটটি আপনাকে খেতেই হবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ! আমার হাতে যখন পড়ে গেছেন, তখন আর··· শুনুন, মেয়েকে আপনার আমি একেবারে বাড়িতে এনেই দেখব, বুঝলেন?”

“বাড়িতে এনে? মানে?” তারাপদ বোকার মতো তাকান।

জীবনগিন্নি প্রাঞ্জল হন, “হ্যাঁ, হ্যাঁ, একেবারে বউ-বরণের সময়েই দেখব। এ-মেয়েকে আর দেখাদেখির কিছু নেই। একে আমি আমার খোকার বউ না করে ছাড়ছি না। মুখটা অমন ভোম্বল করছেন কেন ভাই? ফিবনকালী ডাক্তারের ছেলের সঙ্গেই তো মেয়ের বিয়ে দিতে চাইছিলেন আপনি! তো খালপারের হোমো ডাক্তারের ছেলে না হয়ে না-হয় এনার ছেলেই হল। আমার ছেলেও কিছু ফেলনা নয় ভাই!”

“ছি ছি, এ আপনি কী বলছেন দিদি?”

তারাপদ বিনয়ে গড়িয়ে পড়েন, “এ তো আমার স্বপ্নের অতীত। তা হলে···ইয়ে···টাকাটার ব্যাপারে কী হবে?”

জীবনকালী দপ্‌ করে জ্বলে ওঠেন, “টাকা-ফাকা আমি দিতে পারব না! এক পয়সাও না। আমি হচ্ছি দিন-আনা দিন-খাওয়ার মানুষ! বললেই হল কুড়ি হাজার টাকা দিতে হবে! টাকা কি খোলামকুচি? মামদোবাজি নাকি?”

জীবনগিন্নি হেসে ফেলে বলেন, “কী বকছ পাগলের মতো? তোমায় কে টাকা দিতে বলছে। দেবার কথা তো ওঁরই। তবে···”

“বটে! ওঁরই দেবার কথা? উনি ওঁর এত কষ্টে মানুষ-মুনুষ করা মেয়েটাকেও দেবেন, আবার গাদাগুচ্ছের টাকাও দেবেন! অথচ উনি হলেন খুব সুস্থমাথা আর আমি হলাম পাগলের মতো? এই শুনে রাখুন গদাইপদবাবু, মেয়ে বাদে যদি আর কিছুটি দিতে চেষ্টা করবেন, তো আপনাকে চ্যাংদোলা করে ধরে গোটাকতক ট্যাবলেট খাইয়ে ছাতের ঘরে বন্ধ করে রাখা হবে। ইয়ার্কি পেয়েছে সবাই!··· খোকা! এই খোকা! আছিস কোথায়?··· এই যে এতক্ষণে আসা হল বাবুর! কী এত রাজকার্য হচ্ছিল? এই ভদ্রলোক তোমায় একটু দেখবেন বলে কখন থেকে বসে আছেন। এতটুকু সৌজন্য সভ্যতা নেই? কারই বা আছে? ব্যাটা গগন শোঁ করে সাইকেল চালিয়ে নাকের সামনে দিয়ে চলে গেল। আগাপাশতলা চাবকাতে হয় ব্যাটাকে! সৌজন্য নেই! ভব্যতা সভ্যতা নেই?”

‘খোকা’ শঙ্কিত হয়ে বলে, “কেন, সে আবার কী করল?”

“বলি কী না করল? বখশিশটা নিয়ে যাবার দেরি সইল না? এত তাড়া?”

“বাঃ! হঠাৎ বখশিশের কথা কেন? কী এমন মহৎ কর্ম করলেন তিনি?”

“করল না? বলিস কী রে খোকা? তোদের কোনো কৃতজ্ঞতাবোধ নেই।” জীবনকালী আরও উদ্দীপ্ত হলেন, “ওই গগনা ব্যাটা যদি এই হরিপদবাবুকে ভুল করে এখানে নিয়ে না এসে, সেই খালপাড়ের হোমিও জেবনকালীর কাছে ঠেলে গিয়ে উঠত, কী লোকসানটাই হত আমাদের, ভেবে দেখেছিস সেটা? অমন সরস্বতী-ঠাকরুনের মতন বউটি হাতছাড়া হয়ে যেত, আর নগদ করকরে কুড়ি-কুড়িটি হাজার টাকা জলে যেত!”

খোকা অবাক হয়ে বলে, “নগদ কুড়ি হাজার টাকা! আপনার যেত?”

“আরে বাবা, আমার না যাক, আমার বেয়াইয়ের যেত। যেত কিনা? দুটোয় তফাত কী? বাপু হে, এ হচ্ছে হিসেবি জীবনকালীর পাকা হিসেব! কই, দেখি আর-একবার ছবিখানা!”

ছবি : দেবাশিস দেব

অন্ধকারে কে ঘুসি মেরেছিল শুভ্রদীপকে ?

অভ্রদীপের কারসাজি

রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়

ঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে গেলাম।

অমন যে সুন্দর নকশাকাটা মাটির বোকাভাঁড়, মেয়েরা যাকে বলে লক্ষ্মীর ভাঁড়, ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে মেঝেময় ছত্রখান হয়ে পড়ে! চকচকে ঝকঝকে সিকি-আধুলিগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে এধারে-ওধারে। যেন টাঁকশালের ট্যাঁক থেকে এইমাত্র খসে পড়েছে।

বলা বাহুল্য, ভাঁড়টা বেশ বড়ই। অন্তত হাজারখানেক টাকার খুচরো তাতে ধরে। অবশ্য সিকি-আধুলিতে, পাঁচ-দশ পয়সায় নয়। অভ্রর অনেক সাধের বোকাভাঁড়। অনেকদিন থেকে, মানে সেই যখন প্রথম চার-পাঁচ বছর বয়সে পয়সার হিসেব শিখতে শুরু করেছে, জমাতে আরম্ভ করেছে সে। রাত্রে বাড়ি ফিরে জামা খুলেছি কি খুলিনি, পকেট হাতড়ে দেখত চকচকে কিছু আছে কি না। এখন, পৈতে হবার পর, অবশ্য সে স্বভাব আর নেই। কাছে এসে দাঁড়ায়, থাকলে নিজেই দিই। দিয়ে দিয়ে এমন অবস্থা হয়েছে যে, বাড়িতে ফেরার পর প্রায়ই একটা গৃহযুদ্ধের অভিযোগ শুনতে হয়। যুদ্ধটা শুভ্রর সঙ্গে। বক্তব্য : বাবা যখন দিচ্ছে, তখন ওই ভাঁড়ের অর্ধেক পাওনা তার। অভ্র ফোঁস করে ওঠে। বলে : তা কী করে হবে! ছেলেবেলা থেকে সে বাবার কাছে চেয়ে-চেয়ে নিয়েছে। তাছাড়া পৈতের পর ভিক্ষের টাকাগুলো প্রসাদজ্যাঠাকে দিয়ে সে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে সিকি-আধুলি করিয়ে এনে ওতে ফেলেছে। সুতরাং ওর পাওনা হয় কী করে? এ নিয়ে নিত্যি অশান্তি ওদের মায়ের সঙ্গে। মায়ের বক্তব্য, "তুমি বড় একচোখোমি করো। বড় ছেলেই তোমার সব, ছোটটা বুঝি কেউ নয়?"

মাঝে-মাঝে যদি বলি, "এ-মাসটা বড় টানাটানি যাচ্ছে অভ্র, যদি কিছু—"

কথা আমাকে শেষ করতে হয় না। তার আগেই অভ্র বলে ওঠে, "বুঝেছি। ভাঁড় ভাঙতে বলছ। ওকথা মুখে এনো না তো! তুমিই তো একবার বলেছিলে, বোকাভাঁড়ে পয়সা জমায় বোকারা, তবে জমাতে-জমাতে চালাক হয়ে ওঠে। যদি কোনোদিন আবার সেই ভাঁড় ভেঙে ফেলে সে, তাহলে একেবারে ফুল-বোকা হয়ে যায়। কী, বলোনি?"

অগত্যা বোকার মতোই চেয়ে থাকতে হয়। মনে পড়ে না,

কবে কখন কোন্ সূত্রে কী কথা বলেছি !

সেই বোকাভাঁড় আজ চূর্ণ-বিচূর্ণ !

এবং আশ্চর্য, অভ্র সামনে বসে। ক্ষোভ, দুঃখ, রাগ বা অভিমানের লেশমাত্র চিহ্ন নেই মুখে ; বরং সহজ স্বাভাবিক হাসি-হাসি মুখ।

বিস্ময়ের সঙ্গে মুখ দিয়ে স্বতঃই বেরিয়ে এল আমার, "কী ব্যাপার অভ্র, তোমার ভাঁড়ের এই অবস্থা কেন ? ভাঙল কী করে ?"

স্বাভাবিক গলাতেই অভ্র জবাব দিল, "ভাঙেনি, ভেঙেছি !"

"ভেঙেছিস ! হঠাৎ ?" আমার বিস্ময় যেন আরও বাড়ে।

"ভেঙেছি, কারণ এই পয়সা দিয়ে আমি বাড়িতে একটা ভোজসভা বসাব !"

"আমি তো থ ! অভ্র বলে কী ! ওর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল ? বোকাভাঁড় ভেঙে ও বসাবে ভোজসভা ? আমার মাথাটা কেমন ঘুরে গেল মনে হল। হাতের ব্যাগটা সোফার হাতলে রেখে কপালের ঘামটা মুছতে যাব, এই সময় চুড়ির আওয়াজ তুলে যথারীতি আঁচলে হাত মুছতে-মুছতে ঘরে ঢুকল বীথি। ওর দিকে ঘাড় ফেরাতে-না-ফেরাতেই ও বলে উঠল, "তোমার বড় ছেলের মাথা খারাপ হয়ে গেছে, ওকে ডাক্তার দেখাও। নিশ্চয়ই ভূতে পেয়েছে—নইলে হঠাৎ এমন ভূতভোজন করানোর কথা বলে !"

"ভূতভোজন ! তার মানে ?"

"ভূতভোজন নয় তো কী ?" বীথির গলায় রাগের ঝাঁজ, "সেদিন যে ছেলেগুলোর সঙ্গে খেলতে গিয়ে আধমরা হয়ে ফিরল তোমার ছোট ছেলে, সেই অলপ্পেয়ে ছেলেগুলোকেই কিনা নেমন্তন্ন করে বাড়িতে এনে ভূরিভোজন করাতে চায় ! সারা বিকেল আমি অনেক বুঝিয়েছি, আমার কথা শোনেনি। ভাঁড়টাকে ভেঙে বসল ! এখন দ্যাখো, তুমি যদি কিছু করতে পারো !"

কয়েক মিনিটের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেলাম। গুম হয়ে রইলাম কিছুক্ষণ, তারপর জামা-প্যান্ট বদলে বাথরুম থেকে হাত-পা ধুয়ে যখন ঘরে ঢুকছি, পায়ের আওয়াজ পেয়ে অভ্র সহর্ষে বলে উঠল, "পাঁচশ উনপঞ্চাশ টাকা পঁচিশ পয়সা। এতে জনা পঁচিশ-ত্রিশ ছেলেকে পেটপুরে খাওয়ানো যাবে না বাবা ? অবশ্য আমরাও আছি এর মধ্যে ! আর আছেন শুভ্রর স্কুলের তিনজন মাস্টারমশাই।"

হঠাৎ এ যে কী ধরনের উদ্ভট ইচ্ছে হল অভ্রর, হদিস বার করতে আমার মগজের ঘিয়ে তো অন্তত কুলোল না। তাই একটা কথাই শুধু বললাম, "যাবে, কিন্তু লাভ কী খাইয়ে ?"

"লাভ ?" সিকি-আধুলির মনুমেন্টগুলো ঠিকমতো সাজাতে-সাজাতে অভ্র বলল, "আনন্দ—স্রেফ আনন্দ ! আমার পৈতের সময় শুভ্রর বন্ধুদের খাওয়ানো হয়নি বলে ওর মনে বড় দুঃখ। সেই দুঃখটাই আমি দূর করতে চাই।"

"তার জন্যে বোকাভাঁড় ভেঙে ? শুভ্রর সঙ্গে দিনরাত খুনসুটি করো বোকাভাঁড়ের ভাগ দেব না বলে, আমার দরকারের সময় মুখ ঘুরিয়ে নাও, মা চাইলে ঝেঁজে ওঠো, আর আজ সেই তুমিই কি না—"

পাঁপড়ভাজার ডিশসমেত চায়ের পেয়ালা হাতে ঘরে ঢুকল বীথি। বলল, "পারলে—ওর মত বদলাতে পারলে ?"

"তোমরা এত জোর করছ কেন বলো তো ?" অভ্রর মুখের চেহারায় উঠতি বয়সের জেদ, "আমার ইচ্ছে হয়েছে, আমি খাওয়াচ্ছি। এতে তোমাদের অমত করার কী আছে ? তোমাদের তো ঘর থেকে কিছু বার করতে হচ্ছে না !"

বুঝলাম, বয়সের জেদ ধরেছে অভ্র, তাই চুপ করে গেলাম। কিন্তু বুঝলাম না, সেই ছেলেগুলোকেই কেন খাওয়াতে চায় সে, যারা তার ভাইকে মেরে প্রায় আধমরা করে ফেলেছিল। অবশ্য কথাটা বলা আমার একটু ভুল হল। মেরেছিল একজনই, এবং সে-জনটি যে কে, তা অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। বাকিরা অবশ্য ওকে সাহায্যই করেছিল। সিঁড়ির অন্ধকার ল্যান্ডিং থেকে অজ্ঞান-অচৈতন্য অবস্থায় তুলে এনে শুইয়েছিল স্কুলের উঠোনে, জলের ঝাপটা দিয়ে জ্ঞান ফিরিয়েছিল। অনেকক্ষণ বরফ দেবার পরেও যখন ডান গালের এবং চোখের জমাট রক্তের ফুলো কমাতে পারেনি এবং শুভ্রর যন্ত্রণাকাতর মুখের চেহারা সহ্য করতে পারেনি, সোজা নিয়ে গিয়েছিল হাসপাতালে। হাসপাতাল থেকে বাড়ি। অফিসে ফোন পেয়ে আমি যখন এলাম, বিছানার একধারে শুভ্র তখন ঘুমোচ্ছে। ঘুমের ওষুধ, যন্ত্রণার ওষুধ, এ-টি—সবই দেওয়া হয়েছে। এ-টি-র যে বিশেষ প্রয়োজন ছিল, তা নয়। তবু রগের কাছে একটা জায়গায় একটুখানি কেটে গিয়েছিল বলে ডাক্তাররা আগে থেকে সতর্ক হয়েছেন।

অথচ মজা এই যে, ব্যাপারটা অতি সামান্যই। ছেলেয়-ছেলেয় ঝগড়া, সে তো হামেশাই হয়ে থাকে। এর আগেও অনেকবার হয়েছে। খেলতে গিয়ে এ ওকে ঠেলে দিল, কি পায়ে পায়ে ঠোক্কর লেগে হাড় সরে গেল কারও কিংবা মাথায় খানিক চোট পেল, কি থুতনি-কনুই ছেঁচে গেল—ডেটল-তুলো-ব্যান্ডেজের প্রাথমিক চিকিৎসা পর্যন্ত গড়িয়ে থেমে গেল ব্যাপারটা। কিন্তু এবারের ঘটনাটা ঠিক তা নয়। শুরুটা সামান্য দিয়ে হলেও শেষটা গিয়ে পৌঁছল এমন এক পর্যায়ে, যাকে কোনোমতেই আর তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

সারা স্কুলের মধ্যে গোলকিপার হিসেবে শুভ্রর ভীষণ সুনাম। যখন যেদিক দিয়েই বল আসুক না কেন, শুয়ে বসে কিংবা ডাইভ দিয়ে দু-হাতের একটাতে বল ও ধরে নেবেই। এমন কী, সময়ে-সময়ে পেনাল্টি কিকের ক্ষেত্রেও। ও যে-দলে থাকবে, জয় তাদের অনিবার্য। তাই স্কুলের অনেকেরই আপত্তি ওকে খেলায় নামাতে। খেলায় হারজিত আছেই, তবে প্রতিবার প্রতিক্ষেত্রে একটা টিম হাজার খারাপ খেলেও যদি জিতে যায়, তাহলে খেলার আনন্দটাই যে মাটি ! তাই ইদানীং ও নামবে শুনলে বিপক্ষদল বেঁকে বসে খেলবে না বলে। অনেক দিন বসিয়েও রেখেছে তারা শুভ্রকে।

সেদিন ম্যাচ ছিল সেভেনের সঙ্গে এইটের। কথা ছিল, শুভ্রর বদলে গোলে নামবে বুবাই, আর শুভ্র থাকবে ব্যাকে। খেলা বিকেলে, স্কুল-সংলগ্ন মাঠটায়। বিপক্ষ দল খুব খুশি। জিত তাদের হবেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে, বুবাই এসে হাজির হয়নি—মামার বাড়ি না কোথায় গেছে যেন। সেভেনের দল ঠিক করল শুভ্রকেই নামাবে গোলে। কথাটা রটে যাওয়া মাত্রই এইটের দল গেল খেপে। তাদের ধারণা, ইচ্ছে করেই নাকি বুবাইকে সরিয়ে রেখে শুভ্রকে গোলে নামানো হচ্ছে, এবং সেটা নাকি শুভ্ররই কারসাজি। এইটের দলের সবাই অবশ্য যে খেপল তা নয়, কেউ কেউ খেপল।

যারা খেলার পক্ষে তাদের সংখ্যাই বেশি। তাই শেষ পর্যন্ত ঠিক হল শুভ্রকে গোলে নামিয়েই খেলা হবে। তবে সরবে তারা সবাই একটা কঠোর প্রতিজ্ঞা করল যে, যে-করেই হোক শুভ্রর টিমের মুখে সেদিন তারা চুনকালি মাখাবেই মাখাবে।

সকাল থেকেই আকাশটা মেঘে ঢাকা ছিল, খেলা শুরুর ঠিক মিনিট-পনেরো আগেই সেই মেঘ আরও গাঢ় হয়ে উঠল। হয়তো ঝড় উঠবে, কিংবা সজোর বর্ষণ শুরু হবে। তবু খেলোয়াড়ের দল স্কুলবাড়ির দোতলায় উঠে পেছনের দিকের একখানা ঘরে গিয়ে যে-যার পোশাক পালটে মাঠে নেমে এল।

খেলা শুরু হবার কথা ঠিক পাঁচটায়। কিন্তু আশ্চর্য, সময় পার হয়ে গেল, শুভ্রর দেখা নেই। এই তো ছিল, গেল কোথায়? বিপক্ষ-দলের প্রতিজ্ঞার কথা শুনে ভাগল নাকি? কিন্তু পিছু হঠার ছেলে তো শুভ্র নয়! তবে? খোঁজ, খোঁজ! শেষে স্কুলেরই ভেতর, দোতলায় ওঠার সিঁড়ির দ্বিতীয় ল্যাণ্ডিংটায় পাওয়া গেল তাকে। খেলার পোশাক পরে একপাশে কাত হয়ে পড়ে রয়েছে আর মাঝে মাঝে গোঙানির মতো আওয়াজ করে কাতরাচ্ছে, আবার আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। ছেলেরা এ-ওর মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক বিস্ময়ে বলাবলি করতে লাগল, "কী হল বল্ দিকিন? এমন করছে কেন?" শেষে ধরাধরি করে ওকে নামিয়ে আনল উঠোনে। এবং নামিয়েই তারা চমকে উঠল যেন। শুভ্রর ডান দিকের গাল রগ চোখের কোলে জমাট রক্তের কালশিটে। দাঁতের ফাঁক থেকে কশের কাছে খানিকটা কাঁচা রক্ত। বোধহয় দাঁতেও চোট পেয়েছে। কিন্তু পেলটা কী করে এমন? পোশাক পালটে দৌড়ে নীচে নামতে গিয়ে পা হড়কাল? হবেও বা। একে সেকেলে বাড়ির উঁচু-ধাপ সিঁড়ি, তার ওপর আকাশে তখন গাঢ় মেঘের ছায়া।

শুভ্রর মুখ থেকে পরে যা শুনলাম: ঠিক সময়েই সিঁড়ি দিয়ে নামছিল ও। জায়গাটা অন্ধকার বলে একটু আস্তে আস্তেই নামছিল। হঠাৎ কী যে হল, ধাঁই করে সামনে থেকে একটা ঘুঁসি এসে পড়ল তার গালে। সেটা এমনই আচমকা আর সজোর যে, সঙ্গে-সঙ্গে চোখে যেন সর্ষেফুল দেখতে শুরু করল সে। মানুষ চেনার ক্ষমতা পর্যন্ত তার লোপ পেয়ে গেল, ছিটকে গিয়ে পড়ল ল্যাণ্ডিংয়েরএকপ্রান্তে। এরপর কী ঘটেছে না ঘটেছে, কিছুই জানে না সে। আচ্ছন্ন ভাবটা যখন তার কাটল, তখন সে বাড়িতে, বিছানায় শুয়ে। জ্ঞান ফিরলে একটা কথাই সে শুধু বলতে পেরেছিল, যার হাতের ঘুঁসিতে তার এই অবস্থা, তারও পরনে ছিল জার্সি অর্থাৎ খেলার পোশাক। তবে সেই পোশাকধারীটি যে কে, বলা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, আকাশে মেঘ করে থাকায় জায়গাটা এমনই অন্ধকার হয়ে উঠেছিল যে, মুখ-চেনা খুবই কঠিন। তাছাড়া, একইরকম পোশাকে মোটামুটি একই বয়সের ছেলেদের অনেকসময় চট করে শনাক্ত করাও যায় না।

শুধু হেডমাস্টার নন, অন্যান্য টিচাররাও পরের দিন খুব দুঃখ প্রকাশ করলেন আমার কাছে, এবং কথা দিলেন, তাঁরা প্রাণপণ চেষ্টা করবেন যাতে এ-জাতীয় দুর্ঘটনা আর কোনোদিন না ঘটে। কিন্তু আশ্চর্য, ছেলেদের মধ্যে কে যে এই কাণ্ডটা করল, সেটা ঠিক বোঝা গেল না, কারণ কেউই দোষ স্বীকার করল না। তা সে মারের ভয়েই হোক বা অন্য কোনো

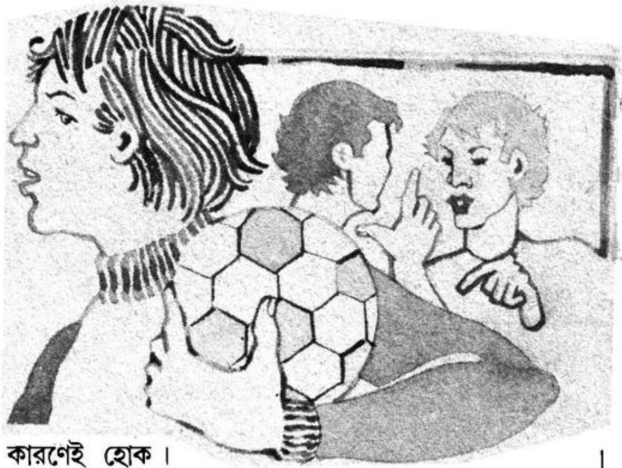

কারণেই হোক।

অভ্র তখন কলকাতায় ছিল না। কাকদ্বীপে বেড়াতে গিয়েছিল ওর মাসতুতো বোন রমাদির বাড়ি। থাকলে অবশ্য কী হত জানি না, তবে না থেকেছে ভালই হয়েছে। কেননা, ইদানীং ও যোগব্যায়াম করছে। ক্যারাটে, জুডো, কুংফু নিয়ে চর্চা করছে, এবং কোথাও কিছু বেচাল দেখলে সহ্য করতে পারছে না। তবে শুভ্রর এই ব্যাপারটায় কী জানি কেন, সে কিন্তু একেবারে চুপ, নির্বিকার, নির্লিপ্ত। সম্প্রতি কাকদ্বীপে 'নিমাই সন্ন্যাস' পালা দেখে এসেছে সে। জানি না, কলসির কানা খেয়েও প্রেম বিতরণের দিকে তার ঝোঁক গিয়েছে কি না। নইলে হঠাৎ অত সাধের লক্ষ্মীর ভাঁড়ই বা টুকরো-টুকরো হবে কেন, আর চকচকে ঝকঝকে পয়সাগুলোই বা ভূতভোজনের পেছনে যাবে কেন?

অগত্যা আমাকে চুপ করতেই হল। ওর জমানো পয়সায় যা ইচ্ছে ও করুক। কিন্তু ওর মা চুপ করে থাকল না। রুপোলি মনুমেন্টের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি কিন্তু আগে থেকেই বলে রাখছি, রান্না করতে আমি পারব না। ভূতভোজনের শখ হলে ঠাকুর-চাকর রেখে করুক। আজকালকার দিনে এমন অনাসৃষ্টি কাজ কেউ করে বলে শুনিনি!" আমার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে তেমনি ঝাঁজালো গলাতেই বলে চলল বীথি, "তোর বাবাও অমনি সায় দিয়ে বসল। আমি কিছু বললেই ফোঁস করে উঠত। কবে থেকে বলছি, লাল পাথর বসানো কানের দুটো ফুল গড়িয়ে দিতে—মেয়েদের কান খালি রাখতে নেই, তার বেলায়—"

মনুমেন্টের চুড়ো ভেঙে ফেলে একটা ছোট ক্যাম্বিসের ব্যাগে ভরতে ভরতে অভ্র বলে উঠল, "কিন্তু তুমি না রাঁধলে সমস্ত আনন্দটাই যে মাটি! তোমার হাতের সুক্তো, মুড়িঘণ্ট আর মাছের কালিয়া খাওয়াব বলেই না এত করা আমার! ভাল রান্না করো বলে কি গুমোর বেড়ে গেল তোমার? বেশ, যদি না করো তো বন্ধ করে দিই!"

আগুনে যেন নাইট্রোজেন গ্যাস পড়ল। বীথিকার মেজাজের ঊর্ধ্বমুখী তাপমাত্রা নিম্নমুখী হতে হতে একেবারে নীচে নেমে এল সঙ্গে সঙ্গে। বলল, "সাধে কি আর বলি বাবা, অনেক দুঃখেই বলি!" চকচকে সিকি-আধুলিগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে নিল বীথিকা, "তা কী কী রান্না হবে একটা লিস্ট্ কর। তোর যখন ইচ্ছে হয়েছে, মরে-মরে হলেও করে দেব'খন!"

এবার শুভ্রর গলা শোনা গেল, "আমরাও তোমাকে সাহায্য করব। জল তোলা, বাটনা বাটা, মাছের আঁশ ছাড়ানো—"

প্রকৃতিই আপনার ত্বকের শত্রু!
ত্বকের সুরক্ষার জন্য প্রাকৃতিক উপাদান ও প্রকৃতিদত্ত উপায়ই সবচেয়ে ভাল...
Borocalendula® ANTISEPTIC CREAM
HL
বোরোক্যালেনডুলা-ই একমাত্র অ্যাণ্টিসেপ্‌টিক ক্রীম যাতে আছে প্রাকৃতিক উপাদান—ক্যালেনডুলা ও হাইড্রাসটিস ভেষজের নির্য্যাস। যা সব সময় আপনার ত্বককে সুরক্ষিত রাখে।
বোরো ক্যালেনডুলা অ্যান্টিসেপ্‌টিক ক্রীম মাখুন, আপনার ত্বক স্বাভাবিক ও সুস্থ রাখুন।
বোরো ক্যালেনডুলা*
অ্যান্টিসেপ্‌টিক ক্রীম
* A PATENT & PROPRIETARY HOMOEOPATHIC MEDICINE, OF HAHNEMANN LABORATORY, CALCUTTA - 12
anjan chakraborty, Cal-74

"থাক, আর সাহায্য করে কাজ নেই! তুমি তোমার নিজের চরকায় তেল দাও তো এখন! দাদার সঙ্গে সারাদিন ধরে শলাপরামর্শ করে বইয়ের পাতা পর্যন্ত খোলোনি একবার, সে খেয়াল আছে?"

দু-দিন ধরে খুবই ধকল গেল ওদের। ঠিকানা সংগ্রহ করে নেমন্তন্ন করা থেকে শুরু করে বাজার-দোকান করা, কোটা-বাটা-রান্না, মায় যত্ন করে পরিবেশন করা পর্যন্ত—কোনোটাতেই এতটুকু ত্রুটি রাখল না অভ্র শুভ্র কি ওদের মা। অভ্র নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তদারকি করল, জোর করে করে, খাবে না তবু রিপিট করল প্রতিটি খাদ্য। ছেলেরা তো বটেই, মাস্টারমশাইরা পর্যন্ত রান্নার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এমন মুখরোচক বস্তু সত্যিই খুব দুর্লভ!

সাবানে হাত ধুয়ে, তোয়ালে দিয়ে মুছে সবাই বাইরের ঘরটাতে এসে বসল। কেউ জিভ দিয়ে দাঁত খুঁটছে তখন, কেউ কাঠি দিয়ে, কেউ বা পরিতৃপ্তির উদ্গার তুলছে সশব্দে। আনন্দে বীথিকা পানের রেকাবি হাতে সেখানে দাঁড়িয়ে। মাস্টারমশাইদের জন্যে পান আর ছেলেদের জন্যে বড়এলাচের দানাভরা মশলা।

রান্নার প্রশংসার পুনরুক্তি করবার জন্যেই বোধ হয় মাস্টারমশাইরা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় অভ্র এক কাণ্ড করে বসল। কোণের দিকের একটা চেয়ারের বাঁ-হাতলে ভর দিয়ে বসে ছিল পিণ্টু নামে যে ছেলেটি, তার দিকে চেয়ে খুব সহজ স্বাভাবিক গলাতেই বলল, "তুমি একবার এদিকে শোনো তো ভাই!"

বলা মাত্রই পিণ্টু কাছে এগিয়ে এল।

অভ্র তেমনি হাসি-হাসি মুখেই বলল, "তুমি সেদিন যা করেছিলে, আর যেন কখনও তা কোরো না। খেলায় হারজিত আছেই, তাই বলে রেগেমেগে এমনভাবে কাউকে মারবে না যে একটা বড়-রকমের কোনো দুর্ঘটনা ঘটে—"

ঘরসুদ্ধ সবার মাথায় যেন হঠাৎ বজ্রপাত হল। নিমেষের মধ্যে সবাই যেন একেবারে পাথর হয়ে গেল, সবারই মুখের অভিব্যক্তি এক। অর্থাৎ প্রচণ্ডরকম অবাক।

অভ্র বলেই চলল, "তোমার ওপর আমাদের কারও কোনো রাগ নেই। তোমরা একই স্কুলে পড়ো, খেলাধুলো করো, একসঙ্গে অনেকক্ষণ কাটাও। তোমরা তো সবাই ভাই-ভাই। তবু দুঃখ এই যে, সেদিন এমন একটা কাণ্ড করে বসলে—"

মুহূর্তের জন্যে পিণ্টু কেমন থতিয়ে গেল। পরক্ষণেই মাথাটা তার যেন আপনা থেকেই নত হয়ে এল। গলার স্বর যথাসম্ভব খাদে নামিয়ে বলল, "আমি ঠিক বুঝতে পারিনি ঘুঁসিটা অত জোরে হয়ে যাবে। আমি চেয়েছিলাম শুভ্রদীপকে রাগিয়ে দিয়ে খেলাটা পণ্ড করে দিতে। কিন্তু এক করতে আর এক হয়ে দাঁড়াল। আমি এর জন্যে খুবই লজ্জিত আর অনুতপ্ত। আমি সবার কাছে ক্ষমা চাইছি এর জন্যে।"

এতক্ষণে হেডমাস্টারমশাইয়ের স্থিরচিত্র সচল হল। বললেন, "কিন্তু তুমি যদি এটা গোড়াতেই স্বীকার করতে, তাহলে ক্লাশসুদ্ধ সকলেই বকুনি খেত না, সকলেই আমাদের চোখে সন্দেহের পাত্র হয়ে উঠত না।"

অভ্রদীপের দিকে ফিরলেন তিনি, "কিন্তু বাবা, তুমি যে এতটুকুন ছেলে হয়ে আমাদের সবাইকে এভাবে বোকা বানিয়ে দেবে, এটা তো ভাবতে পারছি না কোনোরকমেই। কী ব্যাপার বলো তো, তুমি ধরলে কী করে যে, ওই ছেলেটিই তোমার ভাইকে মেরেছিল? কই, আমরা তো পারিনি!"

"পারেননি, কারণ আপনারা ভাবেননি। নইলে না-পারার তো কিছু ছিল না।" বিচারকের সামনে দুঁদে উকিলের মতো ভঙ্গি করে অভ্র বলে চলল, "আপনারা ছেলে পড়ান, তাদের হুটোপাটি দেখেন, তেমন কিছু ঘটলে ফার্স্ট এড, অর্থাৎ তুলো-ডেটল ব্যবহার করেন, কিংবা ট্যাক্সিতে করে হাসপাতালে নিয়ে যান। খেলতে-খেলতে ছেলেদের মধ্যে মারামারি করা কি পড়ে গিয়ে মাথা ফাটানোর দৃশ্য আপনাদের কাছে নিত্যনৈমিত্তিক জলভাতের মতো। এটা অবশ্য খুবই স্বাভাবিক, রোজের ঘটনায় গুরুত্ব থাকে না।" একটু থেমে ফের বলল অভ্র, "অনেক সময় দেখা যায় দোষী একজন, কিন্তু তাকে ধরতে না পেরে ক্লাশসুদ্ধ সবাইকে আপনারা পাইকিরিভাবে সাজা দেন; যেটা এ-ক্ষেত্রেও আপনারা যথারীতি করেছেন। কিন্তু একবারও ভেবে দেখলেন না প্রকৃত দোষীকে ধরা যায় কি না!"

অভ্রর চোখ-মুখের ভাব এবং কথার মধ্যে এমন একটা অভিযোগের সুর ব্যক্ত হয়ে উঠতে লাগল যে, আমার নিজেরই কেমন লজ্জা করতে লাগল। মনে হল ঘরে ডেকে এনে যেন সে সবাইকে অপমান করছে। আমার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে অভ্র বোধহয় আমার মনের কথাটা পড়ে ফেলল। তাই গলার স্বরটা একটু নম্র করে বলল, "আপনারা আমার কথায় কিছু মনে করবেন না স্যার। আমি আপনাদের ছেলের মতো। প্রকৃত দোষীকে ধরার আনন্দেই আমি বোধহয় একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। তাই আপনাদের মতো গুরুজনদের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে অবাচীনের মতো কেমন যেন উদ্ধত হয়ে উঠেছি।"

থাকতে না পেরে ধমকের সুরটাই এবার আমার গলা দিয়ে বেরিয়ে এল, "আরে, ধান ভানতে শিবের গীত না গেয়ে আসল ব্যাপারটাই বল্ না, কেমন করে তুই প্রকৃত দোষীকে শনাক্ত করলি!"

"স্রেফ একটা সাধারণ—অত্যন্ত সাধারণ জিনিস লক্ষ করে।"

"সেটা কী?"

"আঘাতটা শুভ্রদীপের ডান দিকের গালে। ও বলেছে, অন্ধকারে না চিনতে পারলেও সামনে থেকে কেউ যে ওকে মেরেছে, সেটা ও বুঝতে পেরেছিল জ্ঞান হারাবার আগেই। আর, সামনে দাঁড়িয়ে ডান দিকের গালে ঘুঁসি মেরেছে যে, বুঝতে হবে, ডান হাতের চেয়ে তার বাঁ হাতটাই চলে বেশি। অর্থাৎ সাদা বাংলায় আমরা যাকে বলি ন্যাটা। এই সাধারণ ধারণাটা মাথায় আসতেই আমি ঠিক করলাম, কোনো একটা উপলক্ষ ধরে সেদিনকার সব খেলোয়াড়কেই একদিন নেমন্তন্ন করে বাড়িতে খাওয়াব এবং নিজের চোখে লক্ষ করব কে সেই জন যার ডান হাতের চেয়ে বাঁ হাতটাই বেশি শক্ত। তা, আমার অনুমান যে মিথ্যে নয়—সে তো নিজের চোখেই আপনারা দেখলেন, পিণ্টু সব কাজেই বাঁ হাতে করে—খাওয়াদাওয়া লেখাটেখা সবই। বলুন, ঠিক কি না!"

বিস্ময় এবং প্রশংসার অদ্ভুত এক দ্যুতি ফুটে উঠল ঘরের প্রতিটি চোখে।

ছবি : জয়ন্ত ঘোষ

টিনটিন

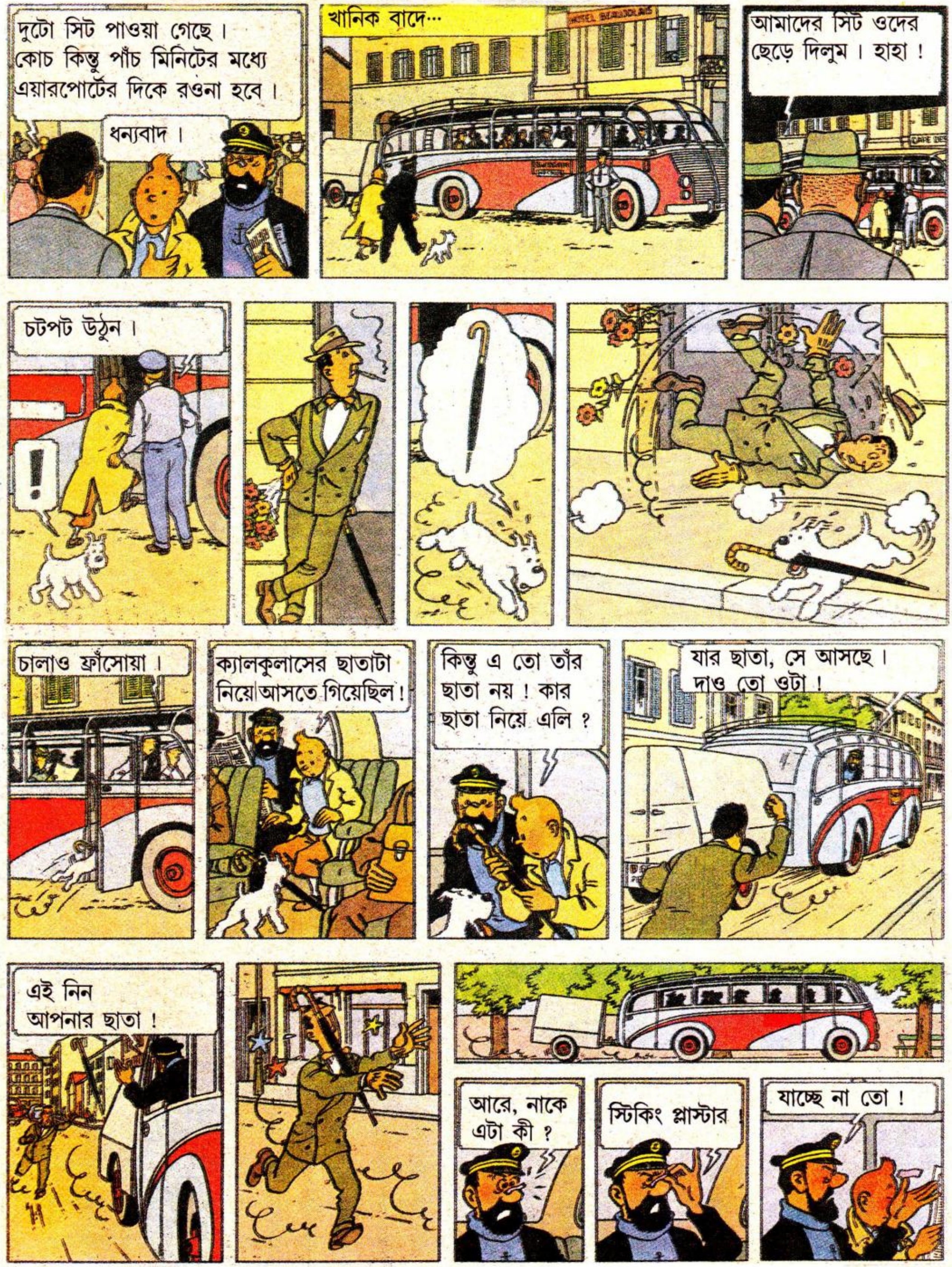
দুটো সিট পাওয়া গেছে। কোচ কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যে এয়ারপোর্টের দিকে রওনা হবে।
ধন্যবাদ।
খানিক বাদে...
আমাদের সিট ওদের ছেড়ে দিলুম। হাহা!
চটপট উঠুন।
!
চালাও ফ্রাঁসোয়া।
ক্যালকুলাসের ছাতাটা নিয়ে আসতে গিয়েছিল!
কিন্তু এ তো তাঁর ছাতা নয়! কার ছাতা নিয়ে এলি?
যার ছাতা, সে আসছে। দাও তো ওটা!
এই নিন আপনার ছাতা!
আরে, নাকে এটা কী?
স্টিকিং প্লাস্টার!
যাচ্ছে না তো!

ক্যালকুলাসের কাণ্ড

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

গোলমাল

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : মাথায় কবিতা আসছে না বলে হরিবাবুর মন খারাপ। বাগানে ঘুরতে-ঘুরতে তিনি একটা উটকো লোকের দেখা পেয়ে যান ভেবেছিলেন চোর-ছ্যাঁচোড়. কিন্তু লোকটা জানায়, হরিবাবুর স্বর্গত পিতা শিবু হালদার তাকে এখানে পাঠিয়েছেন। হরিবাবুকে একটা চাবি দিয়ে সে বলে, "ঈশান কোণ, তিন ক্রোশ" এর বেশি কিছু শিবু হালদার নাকি বলেননি। তারপর

উটকো লোকটার ওপর হরিবাবুর আর তেমন যেন রাগ হচ্ছিল না। তবু রাগের ভাবটা বজায় রেখে একটু চড়া গলায় বললেন, "আমাকে ধাঁধা দেখাচ্ছ ? ভাবছ তোমার সব কথা বিশ্বাস করছি ? ঈশান কোণ আর তিন ক্রোশ, এর কোনো মানে হয় ?"

লোকটা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, "আরে চুপ চুপ। এসব অতিশয় গোপন কথা। শিবুবাবু পইপই করে বারণ করেছিলেন, পাঁচকান যেন না হয়। আমার কর্তব্যটুকু করে গেলাম, ঘাড় থেকে দায় নেমে গেল, এবার তাহলে যাই।"

"গেলেই হল ? তোমার নাম বলো, ঠিকানা বলো, কী কাজটাজ করো একে-একে তাও বলো।"

লোকটা মাথা চুলকে খুব বিনীতভাবে বলল, "নাম তো মেলা। এক-এক জায়গায় এক-এক রকম। কোন্‌টা বলব ?"

হরিবাবু ভড়কে গিয়ে বলেন, "অনেক রকম নাম কেন ?"

"আজ্ঞে সে অনেক কথা, বললে আপনি রাগ করবেন।"

"আহা, যেন এখন আমি রেগে নেই ! আমাকে আর রাগালে কিন্তু একদম রেগে যাব, তখন বুঝবে ! আমার এক ভাই কুস্তিগির, এক ভাই পুলিশ, আমি—"

"আজ্ঞে আর বলতে হবে না। শিবুবাবু খুব গেরোতে ফেলেছেন বুঝতে পারছি। কথাটা কী জানেন, আমি তেমন ভাল লোক নই। যেখানেই যখনই থাকি, একটা-না-একটা অপকর্ম করে ফেলি। ঠিক আমিই যে করি তা বলা যায় না। তবে আমার হাত দুখানা করে ফেলে। তা সে একরকম আমারই করা হল।"

"বটে ! বটে ! তা অপকর্মগুলো কীরকম ?"

"কোথাও খুন, কোথাও ডাকাতি, কোথাও চুরি, এই নানারকম আর কী, পুলিশ পিছনে লাগে বলে নাম ধাম চেহারা সবই পাল্টাতে হয়। তা এই করতে-করতে নিজের নামটা একেবারে বিস্মরণ হয়ে গেল। কখনও মনে হয় চারুদত্ত, কখনও মনে হয় মেঘদূত, কখনও মনে হয় দ্বৈপায়ন। কিছুতেই স্থির করতে পারি না কোন্‌টা। তাই লোকে জিজ্ঞেস করলে যা হয় একটা বলে দিই। এই যেমন এখন আপনি জিজ্ঞেস করার পর হঠাৎ মনে হল আমার নাম বোধহয় পঞ্চানন্দ। কোত্থেকে যে নামটা মাথায় এল, তা বুঝতে পারছি না। এরকম নাম জন্মে শুনিনি।"

হরিবাবু খুব কটমট করে পঞ্চানন্দের দিকে তাকিয়ে রইলেন। লোকটার ওপর সত্যি-সত্যি রাগ করা উচিত কি না তা তিনি বুঝতে পারছেন না। তবে তাঁর তেমন রাগ হচ্ছে না। রাগ কখনও তাঁর তেমন হয় না। আর রাগ হয় না বলেই সংসারে তাঁর মতামতের দাম এত কম। সে যাকগে, হরিবাবু যথাসাধ্য রাগ-রাগ গলায় বললেন, "তুমি তাহলে একজন খুনি, গুণ্ডা এবং চোর ! ঠিক তো ?"

"আজ্ঞে খুব ঠিক। লোক আমি মোটেই সুবিধের নই।"

"কিন্তু তাহলে আমার বাবার সঙ্গে তোমার এত মাখামাখি হল কী করে ?"

পঞ্চানন্দ জামাটা তুলে মুখটা তাই দিয়ে একটু মুছে নিয়ে বলল, "লোক ভাল হলে কী হবে, শিবু হালদার মশাই ছিলেন মাথা-পাগলা লোক। ওই সায়েন্স-সায়েন্স করেই মাথাটা বিগড়োল। আমার চালচুলো ছিল না, এখনও অবিশ্যি নেই, তা আমি সারাদিন কুড়িয়ে-বাড়িয়ে চেয়েচিন্তে চুরি-ডাকাতি করে খেতাম। রাত্তিরের দিকটায় ওই আপনাদের পুবদিককার দালানের বাইরের বারান্দায় চট পেতে শুয়ে থাকতাম। ... তা বাবু, খুব পোলাও রাঁধার গন্ধ পাচ্ছি যে, বাড়িতে কি ভোজ ?"

"রোববারে ভালমন্দ হয় একটু।"

"হয় ? বাঃ, বেশ। তা আপনারা ব্রাহ্মণভোজন করান না ?"

"তুমি কি বাপু ব্রাহ্মণ ?"

পঞ্চানন্দ একগাল হেসে বলল, "ছিলাম বোধহয়। অনেককালের কথা তো। কিন্তু মনে হয় ছিলাম যেন ব্রাহ্মণই। নিদেন দরিদ্রনারায়ণসেবাও তো করতে পারেন।"

স্পর্ধা দেখে হরিবাবু অবাক হন। লোকটা নির্লজ্জও বটে। তবে একেবারে দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিতেও তার বাধছে। লোকটা একটা পেতলের চাবি আর একটা সংকেত দিয়েছে। কোনো গুপ্তধনের হদিস কি না তা হরিবাবু জানেন না। গুলগপ্পোও হতে পারে। হরিবাবু খুব কটমট করে লোকটার দিকে চেয়ে থেকে বললেন, "ঠিক আছে, ব্রাহ্মণভোজন বা দরিদ্রনারায়ণসেবা যাহয় একটা হবে'খন। তবে সে সকলের খাওয়া হয়ে যাওয়ার পরে।"

পঞ্চানন্দ মাথা নেড়ে বলে, "সে আর বলতে। সব বাড়িতেই এক ব্যবস্থা। আমারও হলেই হল।"

"হ্যাঁ, কী বলছিলে যেন ?"

পঞ্চানন্দ মুখটা করুণ করে বলল, "আজ্ঞে সেই হিমালয় থেকে টানা হেঁটে আসছি। মানুষের শরীর তো। একটু বসে-টসে একটু হাঁফ ছাড়তে-ছাড়তে কথাটথা বললে হয় না ? শিবুবাবুর ঘরখানা যদি ফাঁকা থাকে তো তার দাওয়াতেই গিয়ে একটু বসি চলুন।"

হরিবাবু দোনোমনো করে বললেন, "ঘর ফাঁকাই আছে। বাবার ল্যাবরেটরিতে আমরা কেউ ঢুকি না। আমার ছেলে মাঝে-মাঝে খুটখাট করে গিয়ে। তা এসো।"

শিবু হালদারের ল্যাবরেটরি খুব একটা দেখনসই কিছু নয়। বাড়ি থেকে কিছুটা তফাতে, খুব ঘন গাছপালা আর ঝোপঝাড়ে প্রায় ঢাকা, লম্বা একটা একতলা দালান। এদিকটা

খুব নির্জন। ইদানীং সাপখোপের বাসা হয়েছে। ল্যাবরেটরিতে নানা ধরনের যন্ত্রপাতি, শিশিবোতল, জার, রাসায়নিক এখনও আছে। কেউ হাত দেয়নি। বারান্দাটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সেই দাওয়ায় বসে পঞ্চানন্দ জামার ঝুল দিয়ে ফের মুখ মুছল। তারপর বলল, "পোলাওয়ের গন্ধটা খুব ছড়িয়েছে কিন্তু মশাই। তা বেগুনি-টেগুনিও হবে নাকি? চাটনি? মাংস তো বলতে নেই হচ্ছেই। মাছও কি থাকছে সঙ্গে? দই খান না আপনারা? আগে এদিককার রসোমালাই খুব বিখ্যাত ছিল, আর ছানার গজা।"

হরিবাবু আবার রেগে যাওয়ার চেষ্টা করে বললেন, "এটা কি বিয়েবাড়ি নাকি? ওসব খাওয়ার গপ্পো এখন বন্ধ করো। কাজের কথা বলো দেখি।"

পঞ্চানন্দ বেশ জেঁকে বসল। দেয়ালে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে একটা আরামের শ্বাস ফেলে বলল, "এইখানটাতেই শুয়ে থাকতাম এসে। শিবুবাবু অনেক রাত অবধি ঘরের মধ্যে কী সব মারণ-উচাটন করতেন।"

হরিবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, "মোটেই মারণ-উচাটন নয়। নানারকম এক্সপেরিমেণ্ট করতেন।"

"ওই হল। তা একদিন রাত্রিবেলা সবে চোখদুটো লেগেছে, তখন এসে আমাকে ঠেলে তুললেন, 'ওরে ওঠ ওঠ, দেখে যা কাণ্ডখানা।' তা চোখ কচলাতে কচলাতে গিয়ে ঢুকলাম শিবুবাবুর জাদুঘরে। বললে বিশ্বাস করবেন না যা দেখলাম তাতে চোখ ছানাবড়া।"

"কী দেখলে?"

"একখানা কাচের বাক্সে ব্যাঙের ছাতার মতো আকৃতির ঘন ধোঁয়া আর সাদা আগুনের ঝলকানি। শিবুবাবু কী বললেন জানেন? বললেন, জাপানিরা নাকি বড়-বড় গাছের বেঁটে-বেঁটে চেহারা করতে পারে। তাকে বলে বানসাই।"

"জানি। এক বিঘত বটগাছ, ছ' আঙুল তেঁতুলগাছ তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। তা শিবুবাবু সেইরকমই একখানা বানসাই অ্যাটম বোমা বানিয়েছেন। কাচের বাক্সের মধ্যে বিঘতখানেক উঁচু সেই কাণ্ডখানা হল সেই বানসাই অ্যাটম বোমার কাজ।"

"বলো কী?"

"সে তো গেল একটা ঘটনা। বৃত্তান্ত আরও আছে।"

"আছে? বলো ফেলো।"

"শুনবেন? আপনার খিদে পাচ্ছে না?"

"খিদে? না, এই তো লুচি খেলাম। ও হো, না না, আমি তো লুচি খাইনি। হ্যাঁ, খিদে তো পেয়েছে হে।"

পঞ্চানন্দ একগাল হেসে বলল, "ঠিক করতে পারছেন না তো? শিবুবাবুও তাই বলতেন, আমার বড় ছেলেটা একেবারে অকালকুষ্মাণ্ড না হয়ে যায় না। তা নাহয় হল, কিন্তু আবার কবিও না হয়ে বসে।"

একটু সংকুচিত হয়ে গিয়ে হরিবাবু বললেন, "কবিদের ওপর তাঁর খুব রাগ ছিল নাকি?"

"রাগ ছিল না আবার! কবি শুনলেই খেপে উঠতেন। অবশ্য খেপবারই কথা। বয়সকালে ঝুড়ি-ঝুড়ি কবিতা লিখে লিখে কাগজে পাঠাতেন, কেউ ছাপত না। হন্যে হয়ে উঠেছিলেন ছাপানোর জন্য। এমনকী, তিন-চারজন সম্পাদককে ধার পর্যন্ত দিয়েছিলেন। তবু ছাপা হয়নি।

কবিদের ডেকে এনে খুব খাওয়াতেন, কবিদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন, এক কবি তাঁর চেনসুদ্ধু সোনার ঘড়ি ধার নিয়ে আর ফেরত দিল না। আর এক কবি ..."

তাঁর বাবা শিবু হালদারও কবিতা লিখতেন শুনে হরিবাবুর খুশি হওয়ার কথা। কিন্তু হলেন না, ব্যাজার মুখে বললেন, "থাক, আর শুনতে চাই না।"

"সে না হয় না-চাইলেন, কিন্তু খিদের ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত এইবেলা করে নিন। লুচি খেয়েছেন কি খাননি, খিদে পেয়েছে কি পায়নি এসব বেশ ভাল করে ভেবেচিন্তে ঠিক করে নিন। লুচি যদি না খেয়ে থাকেন, তবে আর অবেলায় সেটা খেয়ে কাজ নেই। বরং ব্রাহ্মণভোজনে লাগিয়ে দিন। জিনিসটারও সদ্‌গতি হল, খানিক পুন্যিও পেয়ে গেলেন।"

"তুমি বড্ড বেশি বাচাল তো হে।"

"আজ্ঞে পেটটা ফাঁকা থাকলে আমার বড় কথা আসে। সে যাকগে, যা বলছিলাম। একদিন মাঝরাত্তিরে ল্যাবরেটরি-ঘরে এক ধুন্ধুমার কাণ্ড শুনে ঘুম ভেঙে গেল। তড়াক করে উঠে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি তিনটে এই জোয়ান কালা সাহেব শিবুবাবুকে রাম-ধোলাই দিচ্ছে। দেখে আমি ভিরমি খাই আর কী, কিন্তু ভিরমি খেতে খেতেও দেখলাম শিবুবাবু তিনটে সাহেবকেই একে-একে নিকেশ করে ফেললেন।"

হরিবাবু কেঁপে উঠে বললেন, "বলো কী?"

"তাও আলপিন দিয়ে।"

"অ্যাঁ! আলপিন?"

"তবে আর বলছি কী? ঠিক আলপিন নয় বটে, তবে ও-রকমই সরু আর ছোট্ট পিস্তল ছিল তাঁর, মুখ থেকে সুতোর নালের মতো সূক্ষ্ম গুলি বেরোত। সাহেবরা তো অত কলকব্জা জানে না। শিববাবু তাদের খুন করে আমাকে ডাকলেন। দু'জনে ধরাধরি করে তিন-তিনটে লাশকে ওই বাগানের পশ্চিমধারে পুঁতলাম। দেখছেন না ওখানে কেয়াগাছটার কেমন বাড়বাড়ন্ত। জৈব সার পেয়েছে কিনা।

(ক্রমশ)

ছবি : দেবাশিস দেব

জেনে নাও

জোনাকি জ্বলে কেন

রাতের বেলায় অনেক সময় আমাদের নজরে আসে জোনাকি। সে তার আলো নিয়ে কখনও ঘরের আনাচে-কানাচে, কখনও গাছের ডালে-ডালে, কখনও রাস্তার এ-পাশে ও-পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জোনাকি জ্বলে কেন ?

পুরুষ জোনাকির শরীরের পেছন দিকে লুসিফারিন নামে একটা রাসায়নিক পদার্থ থাকে। এটা শরীরের বিভিন্ন কোষ দিয়ে তৈরি লুসিফারেজ নামের একটা রাসায়নিক বস্তুর সঙ্গে বিক্রিয়া করে। তার ফলে একটা আলো তৈরি হয়। এটাকেই আমরা বলি জোনাকির আলো। জোনাকির এই আলোয় কোনো তাপ নেই।

স্ত্রী জোনাকি কিন্তু আলো দেয় না। যে জোনাকি আলো দেয় তা কেবল পুরুষ জোনাকি।

কোট ঝাঁকালে ধুলো ওড়ে কেন

শীতকালে পশমের কোট-প্যাণ্ট থেকে জমা ধুলো-ময়লা সরানোর জন্যে আমরা সেগুলো ধরে ঝাঁকুনি নিই। তাতে ধুলো-ময়লা বেরিয়ে যায়। পশমের কোট-প্যাণ্ট তো রোজ কাচা যায় না। এইভাবে ঝাঁকুনি দিয়ে ধুলো-ময়লা আমরা সরিয়ে ফেলি।

কিন্তু ঝাঁকুনি দিলে ধুলো-ময়লা ঝরে পড়ে কেন ? হ্যাঙ্গারে একটা কোট ঝুলছে ধরা যাক। সেটা তার নিজের জায়গায় আছে। যেই ঝাঁকুনি দেওয়া হয় বা কোনো কিছু দিয়ে কোটটাকে আঘাত করা হয় অমনি কোটটা তার আগের জায়গা থেকে সরে যায়। সেটা দুলতে থাকে। কিন্তু ধুলোবালি সব কোটের ওপরে ছিল। কোট তার আগের জায়গা থেকে সরে গেলে কী হবে, ধুলোবালিগুলো যেখানে ছিল সেখানেই তাদের থেকে যাওয়ার একটা ঝোঁক থাকে। কিন্তু শূন্যে তো তারা থাকতে পারে না, ফলে খসে পড়ে মেঝেতে। কোট থেকে ধুলো বেরিয়ে যায়।

বসন্তে গাছের পাতা খসে পড়ে কেন

বসন্তকালে যে পাতা খসে তা শীতের আগেই বুড়িয়ে যায়। পাতা বুড়িয়ে যাওয়ার আগে পাতা থেকে হর্মোন কাণ্ডের দিকে চলে যেতে থাকে। তখন পাতার কোষের ভেতরে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে চলে। পাতার বোঁটার গোড়াতে কয়েক স্তর অ্যাবসিশন কোষ তৈরি হয়। একে বলে ছেদন-স্তর।

পাতার কোষের ভেতরে রাসায়নিক পরিবর্তন চলে বলে কোষ-প্রাচীরের বৈশিষ্ট্য আর থাকে না। কোষস্তরের কোষগুলোর কোষ-প্রাচীর পলকা হয়ে যায়। সে আর পাতার ভার ধরে রাখতে পারে না বলে পাতা ছেদন-স্তর থেকে খসে পড়ে।

সাবানে চোখ জ্বালা করে কেন

স্নান করার সময় চোখে একটু সাবান লাগলেই চোখ জ্বালা করে ওঠে। কিন্তু গায়ে সাবান ভাল করে মাখলেও তো কোনো অস্বস্তি হয় না। কেন ? সাবান লাগলে চোখ জ্বালা করার কারণটা কী ?

আমাদের দেহের ত্বক আমাদের বাঁচায় বাইরের সমস্ত প্রতিক্রিয়া থেকে। এই দেহের ত্বক ততটা স্পর্শকাতর নয়। কিন্তু আমাদের চোখ অল্প উত্তেজনাতেই অস্থির। সে ভয়ানক স্পর্শকাতর। একটুতেই তার কষ্ট হয়, সে বেদনা অনুভব করে।

চোখের কর্নিয়ায় (সাদা অংশে) স্নায়ুকোষের প্রান্ত আছে। এই স্নায়ুকোষের প্রান্তগুলো অত্যন্ত সংবেদনশীল। এই প্রান্তীয় অংশ ক্ষার, অম্ল, লবণের মতো জিনিসের ছোঁয়ায় উত্তেজিত হয়ে ওঠে। সাবান ক্ষারধর্মী একটা পদার্থ। ফলে সাবান চোখে লাগলেও চোখে উত্তেজনা হয়। আর তা স্নায়ুতন্তু দিয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছলেই আমরা জ্বালা বা ব্যথা অনুভব করি।

অরূপরতন ভট্টাচার্য

তোমার ছোট্ট ভাইবোনেরা ছবি দেখুক, আর তুমি তাদের পড়ে শোনাও এই

বিদেশী রূপকথা সাহসী ভাইবোন

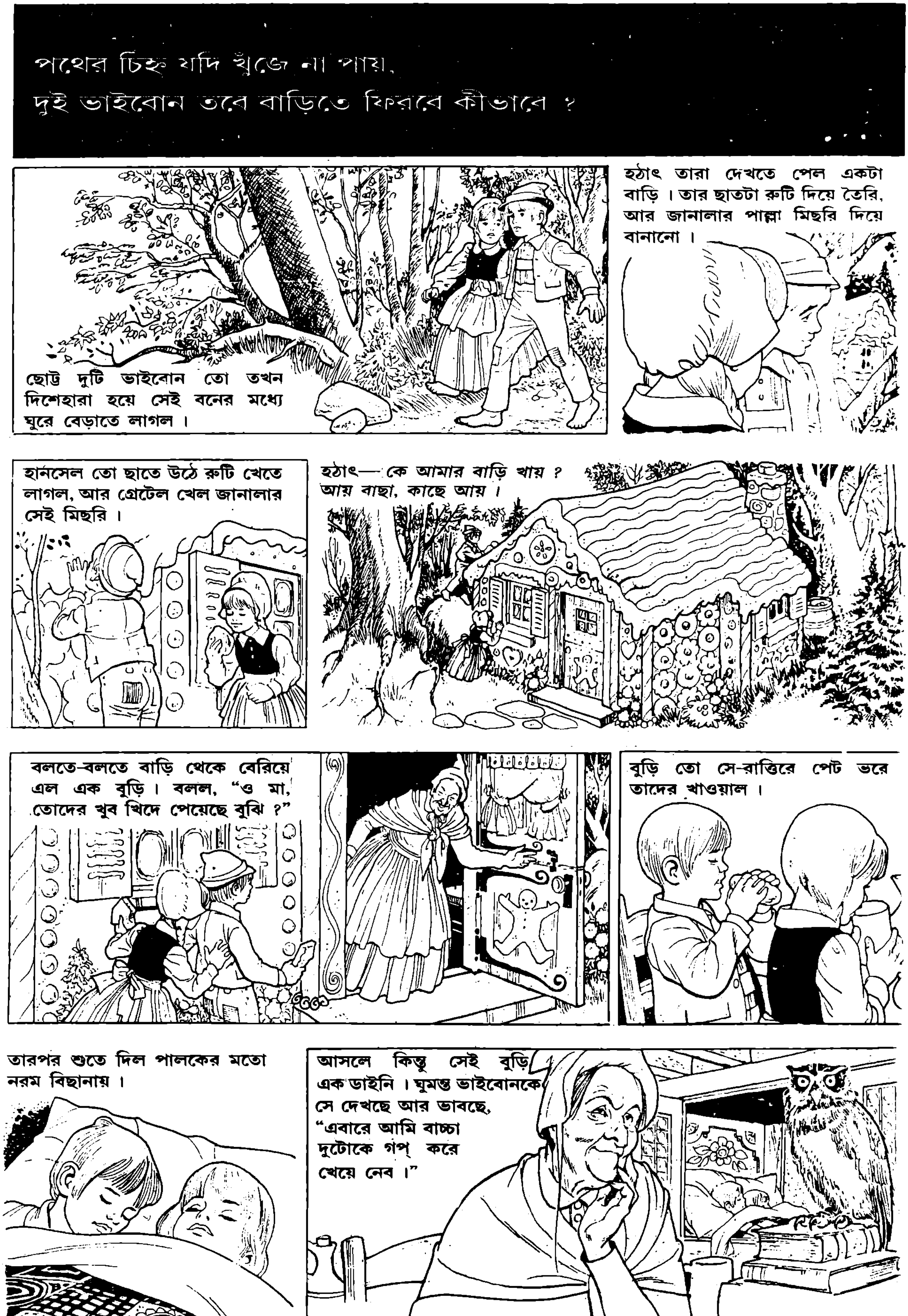
পথের চিহ্ন যদি খুঁজে না পায়,
দুই ভাইবোন তবে বাড়িতে ফিরবে কীভাবে ?
ছোট্ট দুটি ভাইবোন তো তখন দিশেহারা হয়ে সেই বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল ।
হঠাৎ তারা দেখতে পেল একটা বাড়ি । তার ছাতটা রুটি দিয়ে তৈরি, আর জানালার পাল্লা মিছরি দিয়ে বানানো ।
হানসেল তো ছাতে উঠে রুটি খেতে লাগল, আর গ্রেটেল খেল জানালার সেই মিছরি ।
হঠাৎ— কে আমার বাড়ি খায় ? আয় বাছা, কাছে আয় ।
বলতে-বলতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল এক বুড়ি । বলল, “ও মা, তোদের খুব খিদে পেয়েছে বুঝি ?”
বুড়ি তো সে-রাত্তিরে পেট ভরে তাদের খাওয়াল ।
তারপর শুতে দিল পালকের মতো নরম বিছানায় ।
আসলে কিন্তু সেই বুড়ি এক ডাইনি । ঘুমন্ত ভাইবোনকে সে দেখছে আর ভাবছে, “এবারে আমি বাচ্চা দুটোকে গপ্ করে খেয়ে নেব ।”

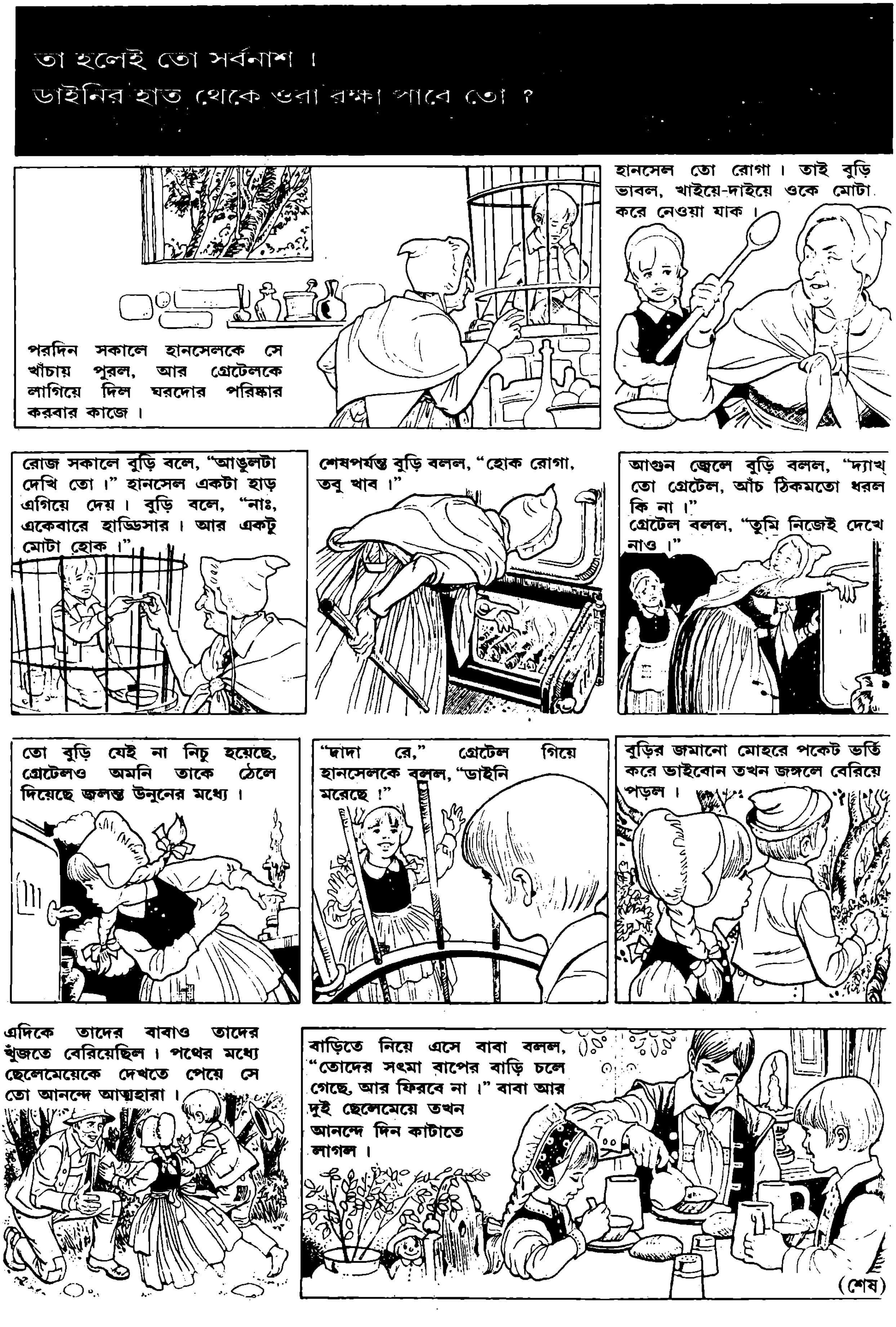
তা হলেই তো সর্বনাশ ।
ডাইনির হাত থেকে ওরা রক্ষা পাবে তো ?
পরদিন সকালে হানসেলকে সে খাঁচায় পুরল, আর গ্রেটেলকে লাগিয়ে দিল ঘরদোর পরিষ্কার করবার কাজে ।
হানসেল তো রোগা । তাই বুড়ি ভাবল, খাইয়ে-দাইয়ে ওকে মোটা করে নেওয়া যাক ।
রোজ সকালে বুড়ি বলে, "আঙুলটা দেখি তো ।" হানসেল একটা হাড় এগিয়ে দেয় । বুড়ি বলে, "নাঃ, একেবারে হাড্ডিসার । আর একটু মোটা হোক ।"
শেষপর্যন্ত বুড়ি বলল, "হোক রোগা, তবু খাব ।"
আগুন জ্বেলে বুড়ি বলল, "দ্যাখ্ তো গ্রেটেল, আঁচ ঠিকমতো ধরল কি না ।"
গ্রেটেল বলল, "তুমি নিজেই দেখে নাও ।"
তো বুড়ি যেই না নিচু হয়েছে, গ্রেটেলও অমনি তাকে ঠেলে দিয়েছে জ্বলন্ত উনুনের মধ্যে ।
"দাদা রে," গ্রেটেল গিয়ে হানসেলকে বলল, "ডাইনি মরেছে !"
বুড়ির জমানো মোহরে পকেট ভর্তি করে ভাইবোন তখন জঙ্গলে বেরিয়ে পড়ল ।
এদিকে তাদের বাবাও তাদের খুঁজতে বেরিয়েছিল । পথের মধ্যে ছেলেমেয়েকে দেখতে পেয়ে সে তো আনন্দে আত্মহারা ।
বাড়িতে নিয়ে এসে বাবা বলল, "তোদের সৎমা বাপের বাড়ি চলে গেছে, আর ফিরবে না ।" বাবা আর দুই ছেলেমেয়ে তখন আনন্দে দিন কাটাতে লাগল ।
(শেষ)

কালো পর্দার ওদিকে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : দিপু আর ইরানি এসেছে বর্ধমানের একটি গ্রামে। ওদের জ্যাঠামশাই চাকরি থেকে রিটায়ার করে এই গ্রামে এসে অনেক রকম বাগান করেছিলেন। কিন্তু কয়েকদিন ধরে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। রাত্তিরবেলা তিনি একা-একা লেবুবাগানে গিয়েছিলেন, তারপর থেকে তিনি উধাও। এখানকার লোকজনদের সঙ্গে কথা বলে কোনো সূত্রই পাওয়া গেল না। দিপু তার দিদিকে না-জানিয়ে মাঝরাতে বাইরে বেরিয়ে পুকুরধারে একজন রহস্যময় লোকের দেখা পেল, তারপর আর দিপুও ফিরে এল না। সকালবেলা ইরানি তার ভাইকে খুঁজে না পেয়ে খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। কোনোক্রমে নিজেকে সামলে নিয়ে সে গেল কাছাকাছি থানায় খবর দিতে। থানার বড়বাবু তাকে নিয়ে গেলেন শ্মশানে এক সাধুবাবার কাছে। তারপর···

দিপুর মনে হল, সে যেন অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে থাকার পর জেগে উঠল। খুব আরাম লাগছে শরীরে। কোথা থেকে যেন ফুরফুরিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। দিপু চোখ মেলে আকাশ দেখতে পেল। ঝিকমিক করছে অনেক তারা। আকাশ দিয়ে কী যেন উড়ে যাচ্ছে। আবছা, সাদা-সাদা মতন।

দিপু কোথায় শুয়ে আছে? সে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। একটা কোনো উঁচু ছাদ। কিন্তু পাঁচিল নেই, চারধারটা খোলা। আর-কোনো লোক নেই। দিপুর ভুরু কুঁচকে গেল। এটা কোন্ জায়গা? সে এখানে এল কী করে? সে তো বর্ধমানের ঘোড়াডাঙা গ্রামে গিয়েছিল, জ্যাঠামশাইয়ের বাগানে। সেখানে তো কোনো পাকা বাড়ি ছিল না? দিদি কোথায় গেল?

তারপর দিপু ভাবল, সে নিশ্চয়ই এখনও ঘুমিয়ে আছে আর স্বপ্ন দেখছে। সে নিজের গালে জোরে একটা চিমটি কাটল। না, স্বপ্ন নয় তো, চিমটিতে বেশ লাগছে।

দিপু উঠে বসল। সত্যিই কোনও বেশ উঁচু আর পুরনো বাড়ির ছাদে সে ঘুমিয়ে ছিল এতক্ষণ। এটা কার বাড়ি?

দিপুর এবারে একটু-একটু করে মনে পড়ল। মাঝরাতে দিদিকে কিছু না জানিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। কে যেন ডাকছিল তাকে। কেউ চেঁচিয়ে তার নাম ধরে ডাকেনি, দিপুর খালি মনে হচ্ছিল কেউ তার জন্য বাইরে অপেক্ষা করছে। ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পর একটা গোলমতন আলো তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। পুকুরধারে দেখা হল একজন মানুষের সঙ্গে। ফর্সা মুখখানা, মাথাটা চকচকে, একটাও চুল নেই। লোকটিকে দিপু আগে কখনও দেখেনি, কিন্তু দেখা মাত্র লোকটিকে ভাল লেগে গিয়েছিল।

কিন্তু তারপর?

দিপু তো কোনও সিঁড়ি দিয়ে ওঠেনি, তা হলে এই ছাদে উঠে এল কী করে? সে তো কোনও সিঁড়ি ভাঙেনি! এত উঁচু একটা ছাদে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলে তার মনে থাকবে না?

দিপু আস্তে-আস্তে গিয়ে ছাদের একপাশে উঁকি মারল। তাকিয়েই তার মাথা ঘুরে গেল প্রায়। অনেক নীচে টলটল করছে জল। সেই জলে দুটো হাঁস ভাসছে। এত ওপর থেকে মনে হচ্ছে একরত্তি পুতুলের মতন।

দিপু এবারে একটু ভয় পেয়ে গেল। এটা তো বাড়ি নয়। এটা তো একটা গম্বুজ। এখানে কে তাকে আনল!

সে আবার মুখ ফেরাতেই দেখল পাশে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। সেই ফর্সা মুখ, চকচকে টাক-মাথা। ঠোঁটে মৃদু-মৃদু হাসি।

দিপুর বুকটা ধক্ করে উঠল একবার। লোকটি তো এখানে ছিল না, কী করে এল?

কিন্তু লোকটির মুখ দেখে দিপুর ভয় কেটে গেল। এই রকম মানুষ দেখলেই মনে হয় এদের কাছ থেকে কোনো আঘাত আসতে পারে না।

প্রথম দেখার সময় লোকটির গায়ে কী রকম পোশাক ছিল তা দিপুর ঠিক মনে নেই। এখন ওর গায়ে একটা পাতলা গেরুয়ার আলখাল্লা।

লোকটি জিজ্ঞেস করল, "কেমন আছ, দিপু? ভাল ঘুম হচ্ছে তো?"

দিপু বলল, "আপনি···আপনি কে?"

লোকটি বলল, "কেন, আমায় চিনতে পারছ না? আগে দেখোনি আমায়?"

দিপু বলল, "হ্যাঁ, দেখেছি। কিন্তু আপনি কে তা তো জানি না!"

লোকটি একটুক্ষণ চিন্তা করতে লাগল। তারপর আপনমনে বলতে লাগল, "আমার একটা নাম থাকা দরকার, তাই না? ঠিকই তো, নইলে আমায় ডাকবে কী করে? তা হলে ধরো আমার নাম ডমরুনাথ।"

দিপু বলল, "ধরো বলছেন কেন? এটা আপনার আসল নাম নয়? আপনার অন্য নাম আছে?"

লোকটি বলল, "আমার অনেকগুলো নাম। এক-এক জায়গায় এক-এক রকম। তুমি আমাকে ডমরুনাথ বলেই ডেকো। কিংবা ডমরুজি।"

নাম নিয়ে আর মাথা ঘামাতে ইচ্ছে করল না দিপুর। সে জিজ্ঞেস করল, "আমি এ কোথায় এসেছি?"

ডমরুজি বলল, "তুমি···তুমি একটা আমবাগানে শুয়ে আছ।"

"আমবাগান? কী বলছেন আপনি? এটা তো গম্বুজের চূড়া!"

ডমরুজি তার ঠোঁটের হাসিটা সারা মুখে ছড়িয়ে দিয়ে বলল, "এটা তো তুমি স্বপ্ন দেখছ। আমাকেও তুমি স্বপ্নেই দেখছ, জানো তো?"

দিপু বলল, "স্বপ্ন? আপনি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন। আমি চিমটি কেটে দেখলাম ব্যথা লাগছে!"

"স্বপ্নে বুঝি ব্যথা লাগে না ? স্বপ্ন দেখে কত লোক ভয় পেয়ে কাঁদে তা জানো ?"

"আমি আর স্বপ্ন দেখতে চাই না। আপনি আমার স্বপ্ন ভাঙিয়ে দিন !"

"ঠিক আছে !"

ডমরুজি ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিপুর দু' চোখ ঢেকে দিল।

তারপরেই দিপু আবার চোখ মেলে দেখল দিনের আলো ঝলমল করছে। তার মাথার ওপর একটা মস্ত আমগাছ ডালপালা মেলে আছে। পাখি ডাকছে। অনেক দূরে একটা গোরুর ডাকও শোনা গেল।

এখানেও তার পাশে বসে আছে ডমরুজি। কিন্তু তার গায়ের আলখাল্লাটার রং সাদা। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা।

দিপু এত অবাক হয়ে গেছে যে, কথা বলতে পারছে না।

ডমরুজি মিষ্টি করে বলল, "কী দিপু, ওঠো। সকাল হয়ে গেছে। আর কত স্বপ্ন দেখবে !"

দিপু ধড়মড় করে উঠে বসে দেখল, সত্যিই সে একটা আমবাগানে শুয়ে ছিল। কোথায় সেই গম্বুজ, কোথায় সেই জলের ওপর পুতুলের মতন হাঁস ! এই আমবাগানেই বা সে এল কী করে ?

ডমরুনাথ বলল, "আমার সঙ্গে কিন্তু তুমি নিজের ইচ্ছেতেই এসেছ। আমি তোমায় ধরে আনিনি, মনে আছে তো ?"

দিপু ঘাড় হেলাল।

"তুমি ঘুমের ঘোরে বাইরে চলে এসেছিলে। পুকুরধারে আমার সঙ্গে যখন তোমার দেখা হল, তখনও তুমি ঘুমিয়ে ছিলে। স্বপ্নের মধ্যে আমার সঙ্গে দেখা হল। আমি তোমার স্বপ্ন ভাঙিয়ে দিলুম। তারপরেও তুমি আমার সঙ্গে আসতে চাইলে, মনে পড়ে ?"

দিপু আবার মাথা হেলাল। তার ঠিক মনে পড়ছে না। কিন্তু এই লোকটি যে সত্যি কথা বলছে, তাতেও তার কোনও সন্দেহ নেই।

ডমরুনাথ আবার বলল, "তুমি যে আমার সঙ্গে চলে এসেছ, এখানে তোমাকে ঘন-ঘন স্বপ্ন দেখতে হবে। আমি বেশিক্ষণ বাইরে থাকতে পারি না।"

"তার মানে ?"

"সে অনেক ব্যাপার। তোমাকে এক কথায় তো বোঝানো যাবে না। পরে একটু একটু করে বুঝবে। তোমার বাড়ির জন্য মন কেমন করছে ? তোমার দিদি তোমার জন্য চিন্তা করবে।"

"আপনি কে ?"

"আমার নাম যে বললুম তোমাকে। ডমরুজি বলে ডাকবে।

"নামটা তো জানলুম। কিন্তু আপনি কে ? আপনি আমার নাম জানলেন কী করে ?"

"নাম জানা আর শক্ত কী বলো। অন্য কেউ তোমার নাম ধরে ডাকলেই তো সেটা আমি শুনে নিতে পারি।"

"আপনাকে আমি আগে কখনও দেখিনি, কিন্তু খুব চেনাচেনা লাগছে।"

"বোধহয় আগে কখনও স্বপ্নে দেখেছ। তা ছাড়া তোমার চোখটা অন্য রকম। তুমি এমন অনেক কিছু দেখতে পাও, যা অন্যরা পায় না। তাই না ?"

"হ্যাঁ, এরকম হয়। সে-কথা আমি অন্য কারুকে বলতে পারি না।"

"তোমার সঙ্গে আমার একটা বিশেষ দরকার আছে। তুমি যে আমার সঙ্গে আসতে চেয়েছ, তাতে আমি খুব খুশি হয়েছি। অনেকেই আমাকে দেখলে ভয় পায়।"

"কেন, আপনাকে দেখলে ভয় পাবে কেন ?"

"ভাবে, আমি বুঝি কোনও অলৌকিক প্রাণী। আর অলৌকিক হলেই ভয়ের ব্যাপার।"

"আপনি ঠিক কে, তা আমিও এখনও পর্যন্ত বুঝতে পারছি না। কিন্তু আমার ভয় করছে না।"

"তুমি যে অন্যরকম ! আমি কে, তা পরে জানলেও চলবে। এখন একটা দরকারি কথা শোনো। তুমি আর তোমার দিদি তোমাদের জ্যাঠামশাইকে খুঁজতে এসেছ তো ?

"হ্যাঁ।"

"তিনি কোথায় আছেন আমি জানি। কিন্তু তিনি ফিরে যেতে চাইছেন না।"

"ফিরে যেতে চাইছেন না ?"

"না। সেটাই তো মুশকিল। খুব তীব্রভাবে ফিরতে না চাইলে কেউ যে ফিরতে পারে না এখান থেকে। তুমি তোমার জ্যাঠামশাইকে একটু বোঝাবার চেষ্টা করবে ?"

"আমার বাবা যে খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। জ্যাঠামশাইয়ের কোনও খবর পাওয়া যাচ্ছে না। আপনি জানেন তিনি কোথায় আছেন ?"

"তুমি যাবে সেখানে ?"

"এক্ষুনি !"

"ভালই হল। আমি তো আর এখানে বেশিক্ষণ থাকতে পারতুম না। সেখানে চলো, সেখানেই আবার তোমার সঙ্গে কথা হবে। ওই দ্যাখো, ঝড় উঠে গেল। এক্ষুনি বৃষ্টি নামবে। এই এক ঝঞ্ঝাট আমাকে নিয়ে।"

"হঠাৎ-হঠাৎ বৃষ্টি ! সেটা আপনার জন্য ?"

"ওসব কথা পরে। চোখ বোজো !"

"দিপু চোখ বুজল। তারপর যেন আবার অনেক সময় কেটে গেল। দিপু এবার স্পষ্ট বুঝতে পারছে যে, সে আবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে।

সে দেখতে পাচ্ছে একটা নদী। তার তীরে একটা বাঁধানো ঘাট। নদীর জলে ঢেউ উঠছে ঘন-ঘন। জলের ওপর রোদ পড়ে চিকচিক করছে। কয়েকটা চিল ঘুরে-ঘুরে ডাকছে।

ঘাটের কাছে জলে পা ডুবিয়ে বসে আছে একজন মানুষ। দেখা মাত্র দিপু চিনতে পারল তার জ্যাঠামশাইকে।

(ক্রমশ)

রোভার্সের রয়
গোপনে চকফোর্ডের খেলা দেখতে গিয়ে পিছল স্টেডিয়ামে আছাড় খেয়েছে রয়…
উঃ
আপনারা খেলা দেখুন। আমি ওঁর ভার নিচ্ছি।
লোকটাকে চেনা মনে হচ্ছে!
'রয়' বলে ডাকল!
আরে, এ যে রয়!
রোভার্সের রয় এখানে কেন?
ব্ল্যাকি, চটপট এখান থেকে সরে পড়া দরকার!
সেই মুহূর্তে…
আরে, এ তো দারুণ খবর!
ফোটো তুলতে দিন!
খবরটা জানাজানি হলেই তো সর্বনাশ!
পালাচ্ছে!
ধরুন, ধরুন!
পরদিন সকালে…
গোপনে চকফোর্ডের খেলা দেখতে গিয়ে
রোভার্সের রয় ধরা পড়ে গেলেন
গোপনে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে চকফোর্ডের খেলা দেখতে গিয়েছিলেন রোভার্সের রয়। চকফোর্ডের খেলার ছকটা দেখে নিয়ে সেই অনুযায়ী এর পরের খেলায়
ঠিক করে
রোভার্সের ডাক্তার রয়কে দেখছেন…
কী মনে হচ্ছে?
একটা লিগামেন্ট জখম হয়েছে!
মনে হয়, ওটার অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না!
সব শুনলুম!
স্যাম!

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

তরতাজা স্বাদ, চনমনে গন্ধ...
আর ফলে ফলে ঠাসা...
' কাঞ্চন '
Kanchan
MANGO JUICE
Kanchan
ORANGE JUICE
দার্জিলিং আর পাহাড়তলির বাছাই
করা ফল থেকে–জিভে জল আসা
জ্যাম, জেলী, মার্মালেড, স্কোয়াশ,
সস্, টিনেভর্ত্তি জুস্, আনারসের
মিষ্টি চাকা আর টিট্‌বিট্‌স্।
Kanchan
Darjeeling Fruit & Vegetable
Processing Co-operative Society Ltd.
Mileage/K-2

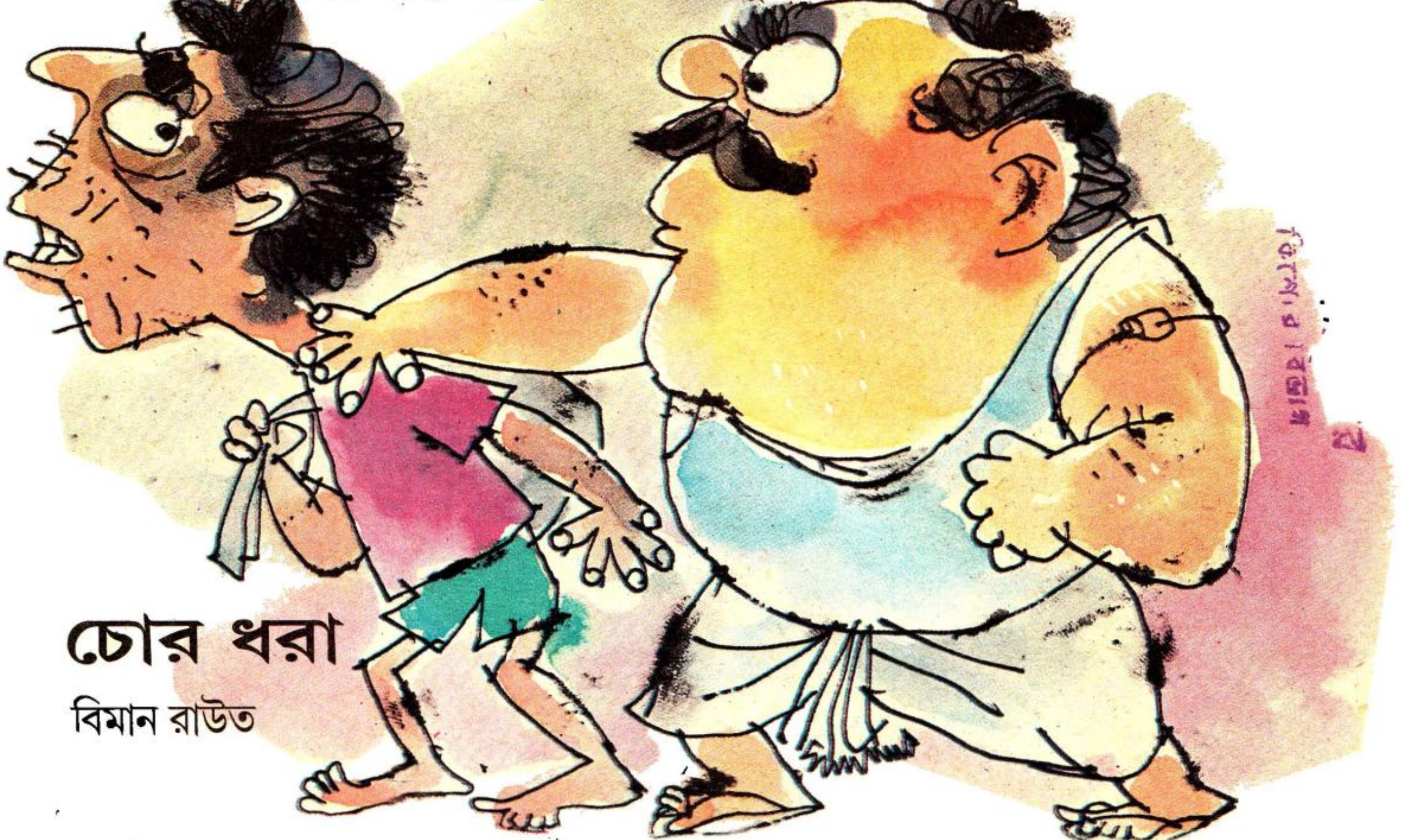

চোর বলে, "ছেড়ে দ্যান কর্তাবাবু !"

চোর ধরা

বিমান রাউত

ক'দিন ধরে কাজের লোক আসছে না । বাড়ির সবার মাথা গরম । প্রথমে মা । তাঁর মেজাজ চড়ে যায় চড়চড় করে, আর সেইসঙ্গে চড়িয়ে দেয় বাবার মেজাজ । বাবার টেম্পারেচার ঢুকে যায় কাকুমণি আর ছোটপিসির মধ্যে । সবাই তখন এক চরিত্রের—গুড কণ্ডাক্টর অব হট মেজাজ । মাঝখান থেকে ঋক্, বুম, সোনাইদের ঝামেলা বাড়ে ।

কিন্তু এর বিহিত কোথায় ! ঠিকে-লোক, চাকরি খাবে কে ? সে এলেই আবার বাড়ির মেজাজ ডাউন । বড়রা কি এত বোকা ? ঠিকে-লোককে মেজাজ দেখিও না, সে পরোয়া করে থোড়াই । তার চাকরি পাওয়া ইংরেজ আমলের চাকরির মতো । কোয়ালিফিকেশন লাগে না । আজ এটা গেলে সে হাসতে হাসতে কালই ঢুকে যাবে অন্য বাড়িতে ।

মা তবু খচখচ করে কথা শোনান । লোক এলে অন্য কোনো বিষয়ের সঙ্গে বাড়ির ঠিকে-লোকেরও কথা উঠবে । বাবা বিরক্ত হন । "ওকে ছাড়িয়ে দিলেই হয়, অত কথার কী দরকার । তুমি কি বিনি পয়সায় খাটিয়ে নিচ্ছ ?"

মা বলেন, "ও চলে গেলে তুমি লোক যোগাড় করে দেবে ?"

ব্যস, লজিকের লাইনে বিরোধীপক্ষ বসে গেল । বাবা বলেন, "কী অদ্ভুত যুক্তি ! তুমি বকবে, মেজাজ খারাপ করবে, অন্য লোকের মেজাজ নষ্ট করবে, আবার ওকে ছাড়াবেও না ! এটা কী করে হয় ?"

মা তখন বলেন, "সংসার আমাকে করতে হয়, তাই যুক্তিও ওরকম । বুঝেছ ? আর বুঝবেই বা কী, আমি বিছানা নিলে তখন দেখব এ সংসার কী করে চলে ।"

মামুকেও মা এসব বলছিলেন । মামু তো শুনে-শুনে পাগল । তবে কিনা শুনতেই হবে । একটা মাত্র দিদি বলে কথা । সেদিন সন্ধ্যায় মা তো মামুকে ঠিকে-লোকের দৌরাত্ম্য নিয়ে যথারীতি লেকচার দিচ্ছেন । মামু দাবা খেলবে বলে এসেছিলেন বাবার সঙ্গে । এই লেকচারের পাল্লায় পড়লে তো বারোটা বাজবে খেলার ।

মামু কালো কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন, "দিদি, তোর এত বুদ্ধি শুধু মেজাজ করে করে শ্রিঙ্ক করে গেল । অত গরমে চুবোলে অমন ফাইন জিনিস না-কুঁচকে পারে ?"

বাবা এত জোরে হাসলেন যে, ছোটপিসির হাত থেকে বই পড়ে গেল । সোনাই চমকে ডিভানের ওপর শুয়ে পড়ল ।

মা চোখ পাকিয়ে বললেন, "দ্যাখ্ বৈদ্যনাথ, যা বুঝিস না, তা নিয়ে বাক্যি ঝাড়িস না ।"

মামু তাড়াতাড়ি বললেন, "আহা, তুই আবার মেজাজ খারাপ করিসনে । গজু ভট্‌চাযের গপ্পোটা শোন তবে !"

ঋক্, বুম, সোনাই সঙ্গে-সঙ্গে মামুর কাছাকাছি । ঋক্ মার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে চমকে গেল । মার মুখে কেমন যেন চাপা-চাপা একটা ভাব । হাসি লুকোবার চেষ্টা করছেন নাকি ?

বাবা সিগারেট ধরান । মামুর গল্প মানেই জমাটি । সুতরাং জমিয়ে বসা যাক ।

॥ ২ ॥

গজু ভট্টাচার্য পেল্লাই বড়লোক ছিলেন সেকালে । তাঁর বাড়িতে চোর ঢুকত না । কিন্তু কেন ? এটা ছিল রহস্য ।

অনেকে জানত। অনেকে জানত না। তবে ওই তল্লাট আর আশপাশের তল্লাটের নিশিকুটুম্বরা নাকি বলাবলি করত, "আর যে-বাড়িতেই যাও, গজু ভট্চাযের বাড়িতে ঢুকো না।" গজু ভট্চাযের বাড়ি বড়লোকের প্রকাণ্ড বাড়ি। দেউড়িতে ভোজপুরী দরোয়ান। মেহগনি কাঠের মজবুত সদর-দরজা, লোহার হুড়কো। বাড়িভর্তি লোক। কাজ করার লোক জনা-চার। কালো, তাগড়াই। তবু গজু-গিন্নি দুঃখ করেন, লোক বড় কম। আরও দু-একটা লোক হলে ভাল হয়। রোজ দেড়মন ওজনের পুজোর বাসন মাজবে, গিন্নি-মা'কে দোতলা থেকে ধরে-ধরে নামিয়ে দরদালানে রাখা কুরসিতে বসিয়ে দেবে। বাগানের এক বিঘে জমিতে তিনি ডাক্তারের নির্দেশে এ-মাথা ও-মাথা করেন বার-দশেক। তখন কাছে কাছে থাকবে। দু' মাইল দূরে গিয়ে বাড়ির বাঁধা কবিরাজমশাইকে গিন্নি-মা'র স্বাস্থ্য আর খিদের বর্ণনা দিয়ে আসবে। এসে কুড়িজন লোকের বিছানা রোদ্দুরে দেবে। দিয়ে এসে বাবুকে তেল মাখাবে। দেড় ঘণ্টা পরে কুয়ো থেকে জল তুলে দেবে। বিকেলবেলা বিছানা ঘরে ফিরিয়ে, গিন্নি-মা'কে উপরে তুলে আবার যাবে কবিরাজমশাইয়ের কাছে। রাতে গিন্নি-মা আজ কী খাবেন, তা জেনে আসতে। কবিরাজমশাইয়ের বয়স তিরাশি। আসতে পারেন না বিছানা থেকে উঠে।

আর-সব লোকও খাটাখাটনি করে। লোকজন কম বলে কাজের চাপ খুব। এই ধরো দশটা গোরুর দেখাশোনা করতে হয়, কাঠ কাটতে হয়, বাড়ি সাফসুতরো করতে হয়, খেত দেখতে হয়। তেলের ঘানি আছে, মাছ ধরা আছে, জল তোলা আছে, বাগান দেখাশোনা করা, কাছারিবাড়ি সাফ করা, বাড়ির ছেলেমেয়েদের তিন মাইল দূরের ইশকুলে পৌঁছোনো আর নিয়ে আসা। কাজ কি একরকম। গিন্নি-মা চেয়ারে বসে-বসে খেলা চালান। প্রচুর ফাউল হয়, আর গিন্নি-মা চড়া গলায় ধমকে যান সারা দিন। যারা জানে তারাই জানে যে, ওই লোকগুলো এই বাড়িতে নিশিরাতে গায়ে তেল মেখে ঢুকেছিল। সেই তেল কবে উড়ে গেছে, এখন শরীরে খড়ি ওড়ে তাদের। লোকগুলোর টিকি বাঁধা গজু ভট্চাযের হাতে। রহস্য জানে কজন? দেউড়ির দরোয়ানরা গোঁফে তা দেয়, আর বলে, "হুঁ, ই আছে গজুবাবুকা মোকান! ইখানে চোর ঘুষতে পারে, নিকলতে পারে না। রামা হো।"

তা একবার হল কী, গজুবাবুর ওইরকম ভয়াবহ বাড়িতে কীভাবে যেন ঢুকে পড়ল এক নিশিকুটুম্ব। ঢুকে তো অবাক। দেউড়ি খোলা। দরোয়ানরা ভোঁসভোঁস করে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। চোর খুব অবাক হয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে। তারপরেই সে হাঁ। ঘরে-ঘরে লোক, দরজা খোলা। আর কত মূল্যবান সামগ্রী সব এদিক-ওদিক ছড়ানো। এ কী ব্যাপার, চোর ভাবে। তখনও তার মাথা পরিষ্কার। কী ফেলে কী নেবে ভাবছে। ভাবতে ভাবতে তার কানে আসে জলপ্রপাতের গর্জন। সে লঘুপায়ে এগিয়ে যায়। একটা ঘরে উঁকি মেরে দেখে, বিশাল এক খাটে বিরাট বপুঅলা এক মানুষ। তাঁর নাসিকা গর্জন করছে, তাতে খাটটা নড়ে উঠছে, মেঝে কাঁপছে। জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটে চোর। বুদ্ধি পাকেনি। না হলে সন্দেহ হবে না কেন দেখে, যে রুপোর বাসন আলমারিতে বন্ধ থাকে, সেসব ছড়ানো আছে মেঝের ওপর। সে ভাবে নাহ্—এখান থেকেই শুরু করা যাক।

আর শুরু! মাটিতে সন্তর্পণে বসে একটা বাসন তুলেছে কি তোলেনি ঝোলার মধ্যে, একটা ঢেঁকির মতো হাত এসে পড়ল তার কাঁধে। আর তখন চোরের মাথায় চিড়িক মারে সাঙ্গাতদের সাবধানবাণী—এটা কি তবে সেই কুখ্যাত গজু ভট্টাচার্যের বাড়ি? চোর ভয়ে চিঁচিঁ করে বলে, "আর করবনি বাবু। ছেড়ে দ্যান কর্তাবাবু। আপনি কি গজু ভট্টাচার্য মহাশয়?"

গজু ভট্চায খিকখিক করে হেসে বলেন, "দেড়মাস ধরে তোর অপেক্ষায় আছি বাপ্। এত দেরি করতে আছে?"

চোর পুনশ্চ চিঁচিঁ করে বিস্ময় প্রকাশ করে, "আমি আসব আপনি জানতেন এঁজ্ঞে?"

কর্তা ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলেন, "তোমার জন্য কি তোমারই জন্য বাপ্? একজনের জন্য তো বটে! তা তুমি ইদিকে নতুন, নয় বাপ? ইদিককার কুটুম্বরা এই বাড়িতে ঘুমিয়ে-ঘুমিয়েও ঢোকে না। দেউড়ি খোলা রাখলেও না। যাক, এসেই যখন পড়েছ, তখন আর কী করা। এখেনে থেকে যাও। পুলিশে দেব না। তবে ত্যাণ্ডাই-ম্যাণ্ডাই কোরো না বাপ—তাতে মুশকিল হবে।"

চোর তখন গড়গড় করে বলতে থাকে এই বাড়ির কথা। অর্থাৎ চোর-মহলে যা সে শুনেছে। শুধু গিন্নি-মা'র ওজনটা বাড়িয়ে বলে, পাঁচমন। গজু তাতে শিউরে উঠে ধমক দেন, "চোপ বদমাস। আমার গিন্নির ওজন নিয়ে ইয়ার্কি!" চোর তখন হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে বলে, "ছেড়ে দ্যান কর্তাবাবু—অত কাজ করতে পারবনি। গতরে জোর নেই। পেটে ভাত না থাকলে কাজ করব কী করে। অন্ধকারে দিষ্টি চলে না, তাই ভুল করে ঢুকে পড়েছি। উঁউঁউঁ—দরোয়ানগুলোকে এটু-আধটু পাহারা দিতে বলতে তো পারেন, তবে কি আর ঢুকি? ওগুলোকে বিদেয় করে ডালকুত্তা পোষেন না কেন? না, আমাকে জেলেই দেন!"

গজু ধমক দিতে যান পুনর্বার। কিন্তু কী ভেবে চোরের পাশে বসে ধুতির খুঁট দিয়ে তার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলেন, "এত বড় মানুষ কাঁদে নাকি? বোকা কোথাকার। আর লোকগুলো কাঁদেনি, তেরিয়া হয়েছিল। তাই ওদের দিয়ে হাজার টাকার বন্ধকি দলিল সই করিয়ে একেবারে জন্মের মতো বন্দী করে রেখেছি। কী জানিস, বাপ, আজকাল এই বাড়ির জন্য মাইনে দিয়েও কাজকর্মের লোক আর পাওয়া যায় না। লোক না থাকলে তোর গিন্নি-মা'র চিৎকারে মড়াও বিছানা থেকে উঠে পড়ে। গিন্নি-মা, জানিস বাপ, আমাকে দিয়েও বাসন মাজায়!" বলে হুহু করে গজু ভট্চায কেঁদে ফেলেন। কাঁদেন আর বলেন, "দেড়মাস ধরে ভাল করে ঘুমোই না, খিদে নেই, শরীর আর্ধেক হয়ে গেছে ভাবনাচিন্তায়, তুই না কাজ করলে কবে আবার লোক পাব? উঁউঁ..."

কাঁদতেই থাকেন গজু ভটচায।

চোর অবাক হয়ে তাকাতে তাকাতে নিজের ধুতির খুঁটটা তুলে নেয়। তারপর বাবুর চোখ মোছাতে মোছাতে বলে, "আপনি আর কাঁদবেন না কর্তা, বুকটা ফেটে যাচ্ছে গো আমার। ঠিক আছে, আমি এখেনেই কাজ করব।"

মামু গল্প শেষ করে উঠে দৌড়ে পালান 'চলি রে দিদি' বলে। নইলে দিদির হাতে মার খেতে হত।

ছবি : দেবাশিস দেব

বিজ্ঞাপন

স্পার্কো-র
এ্যাডভেঞ্চার - ৪
আগুন নিয়ে খেলা
এক সাধু, জঙ্গলে সন্দীপকে দিলেন এক যাদু-আংটি। সন্দীপ যখনই আংটিটা ঘোরাতে ঘোরাতে বলে, "স্পার্কো এসো, স্পার্কো এসো" - অমনি সন্দীপ স্পার্কো হয়ে যায়। (স্পার্কো-র এ্যাডভেঞ্চার - ১ দ্যাখো)
এসো স্পার্কো... স্পার্কো-স্পার্কো
স্পার্কো হয়ে তুমি আলোর গতিতে পৌঁছে যাবে - যেখানে বিপদগ্রস্ত মানুষ তোমার সাহায্যের আশায় বসে আছে। তোমার লোহার টুপির ওপর ঐ চাকতি হচ্ছে প্রক্ষেপণ যন্ত্র - যার বোতামটা টিপলেই দুর্ঘটনার সব কিছু দেখা যাবে।
সোনা আর সুবীর স্কুল থেকে ফেরার পথে গাছ থেকে ঝরা পাতা পা দিয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে।
সুবীর, দ্যাখ - বাগানটা কত নোংরা! কাজের না আসায় গাছের পাতায় চারদিক একাকার!
মা, তুমি চিন্তা কোরো না - আমি সব সাফ করে দেব।
হুঁ! আরে তুই বলিস কি রে!
আমার মতলব... আয় আমরা শুকনো পাতা জড়ো করে বিরাট আগুন জ্বালি!
আজ রাতে মা-বাবা বাইরে যাওয়ার পরে তো?
হ্যাঁ - কেন নয়? রাজ, রোশন শ্যাম আর সুমি - ওদেরও ডাকা যাক!
~ পরে ~
আরে বাঃ, সুবীর! বিরাট আগুন হলে সত্যি খুবই জমবে! একেবারে দাউ দাউ করে ফেলা যাক!
দুর ছাই! আগুন ধরছে না তো...!

একটু কেরোসিন ঢাল না — জ্বালানোর জন্যে।
যাই, কেরোসিনের পাত্রটা আর কিছু ছেঁড়া ন্যাকড়া নিয়ে আসি।
এইবার সব ঠিক জমবে ...।
আগুন!!
~ সহরের আর এক প্রান্তে ~
রোহিত, দরজাটা এঁটে দে তো ... স্পার্কো-র ডাক এসেছে।
BEEP
BEEP
Come
SPARKO
SPARKO
SPARKO
ঐ যে ... বিপদ! আগুন!!

FREE GIFT COUPON

Hey, Kids!

Wouldn't it be fun to have SPARKO at your side, day and night? Ask for your **FREE SPARKO gift** by filling out the details on the reverse, and posting this coupon to :

Loss Prevention Association of India Ltd.,
Post Box No. 810,
Bombay G.P.O.
Bombay — 400 001.

My name is________________

My complete address is________________

____

____

________PINCODE________

Age________________ Sex________

Issued by Loss Prevention Association of India Ltd. to promote fire prevention and safety.

Please write AOS-4 AM on the cover.

maa (n) 603/83

বাচ্চা-বাঘিনী ডোরা

রতনলাল ব্রহ্মচারী

খৈরির কথা নিশ্চয়ই মনে আছে তোমাদের। খৈরি, মানে ওড়িশার যশিপুরের সেই বিখ্যাত পোষা বাঘিনী, কয়েক বছর আগে আনন্দমেলায় যার ছবি দেখে আর গল্প পড়ে তোমরা শ'য়ে শ'য়ে চিঠি লিখেছিলে খৈরির পালক শ্রীসরোজরাজ চৌধুরী ও শ্রীমতী নীহারনলিনী দেবীর কাছে। সেইসব চিঠির কিছু-কিছু আমাকে দেখিয়েছিলেন তাঁরা। চিঠিগুলো পড়ে বুঝতে পেরেছিলুম, খৈরিকে নিয়ে তোমাদের কৌতূহলের শেষ নেই, তাকে খুব ভালবেসে ফেলেছ তোমরা। সেই খৈরি এখন আর নেই, সরোজবাবুও চলে গেছেন, কিন্তু খৈরির স্মৃতি আমাদের মন থেকে মুছে যায়নি।

কলকাতার বসু বিজ্ঞান মন্দিরের বিজ্ঞানী শ্রীজ্যোতি দত্তের সঙ্গে একসময় গবেষণা করেছিলুম খৈরিকে নিয়ে। সম্প্রতি ভারত সরকারের পরিবেশ দপ্তর থেকে একটি বড় গবেষণা-প্রকল্প দেখাশোনার ভার দেওয়া হয়েছে আমাদের উপর। স্টাটিস্টিক্যাল ইন্সটিটিউট ও বসু বিজ্ঞান মন্দিরের যৌথ উদ্যোগে খৈরির মতো একটি বাঘের বাচ্চাকে বড় করে তার উপর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোই এই গবেষণা-প্রকল্পের প্রধান কাজ।

এই নতুন বাচ্চা-বাঘিনীর নাম দিয়েছি 'ডোরা'। মেয়ে তো, তাই 'ডোরা' নামটা দিব্যি মানিয়ে গেছে, তার উপরে আবার তার গায়েও রয়েছে ডোরা-ডোরা দাগ, নামটা সেদিক থেকেও মানানসই, কী বলো ? ছবিতে দ্যাখো, মহিশূর চিড়িয়াখানায় ডোরা আর তার দু'বোন দিব্যি খেলে বেড়াচ্ছে। ডোরাকে কলকাতায় নিয়ে আসবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু নানা কারণে এখনই তা সম্ভব হল না। ডোরা এখন একটু বড়সড়ও হয়েছে। ওর যখন বাচ্চা হবে, তখন তাকেও, আমাদের গবেষণার সুবিধের জন্য, পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কোনো অরণ্য-পরিবেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

গবেষণার বেশিরভাগ কাজই হবে কলকাতার গবেষণাগারে। সেখানে বাঘের স্বভাব-চরিত্র পর্যবেক্ষণ ছাড়াও, তার গায়ের গন্ধ নানা রাসায়নিক উপায়ে বিশ্লেষণ করে ফর্মুলা বার করা হবে। বেশ জটিল কাজ, তাই আমাদের ছোটাছুটিও করতে হবে বিস্তর।

ডোরা বেশ দূরে থাকে, তাই তাকে তোমরা এক্ষুনি দেখতে পাচ্ছ না। ভবিষ্যতে হয়তো কখনও সে-সুযোগ আসবে। আপাতত কল্পনায় জ্যান্ত ডোরার মুখোমুখি হওয়া ছাড়া আর-কোনো উপায় দেখছি না।

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

বড়গল্প

বাকোর ঘুড়ি

সমীর মুখোপাধ্যায়

বিশ্বকর্মা পুজোর দু'চারদিন আগে থেকেই বাকো বারবার বলতে লাগল, "যাক না বিশ্বকর্মার দিনটা একবার। শুধু যেতেই যা দেরি। একবার যাক, তারপর যা করব না বাবা!"

আমি একবার ওর দিকে তাকিয়ে, মুচকি হেসে, ঘাড় নেড়ে একটু সায় দিয়ে খবরের কাগজখানা দ্বিগুণ উৎসাহে পড়তে লাগলাম। বাকো লক্ষ করল, আমি কোনো মন্তব্য করলাম না।

ও একটু ক্ষুণ্ণ হল, কিন্তু সেটা যেন কিছুই নয় এরকম একটা বেপরোয়া ভাব ঠোঁটে ঝুলিয়ে বাকো আবার শুরু করল, "আসলে কী জানো! যখন-তখন পড়লেই তো হয় না। সে বলো না কেন তুমি, আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বই খুলে রাখছি। কিন্তু তাতে কি পড়া হবে? পড়া মানে তো ধ্যান, তুমিই তো বলো, তাই না বাবা?"

আমি কিছুই বলি না, ব্যাপারটা ঠিকই আঁচ করেছি। এসব 'পড়া, ধ্যান-ট্যান' কথার আমদানি কেন, কিসের প্রস্তাবনা, আমার তা' জানতে বাকি নেই। বাকোও তা জানে। তবু ওর ক্ষীণ আশা, বাবার মন ভেজাতে পারবে।

"আসল ব্যাপার কী জানো! আমি পড়াটা এক্ষুনি আরম্ভ করতে চাইছি না। ব্যাপার আছে।" বাকো জুলজুল চোখে আমার দিকে তাকাল।

"কী ব্যাপার?"

"সেই কথাটা তো বলছি। মা যে বলে না 'তোর বাবা সব কথা একটু লেটে বোঝে', এখন দেখছি ঠিকই বলে। আমি যদি অ্যানুয়ালের পড়া এক্ষুনি-এক্ষুনি আরম্ভ করি, তবে পরে আর মনে রাখতে পারব না। তাই জোর দিচ্ছি না তেমন।"

আমি হেসে বললাম, "অদ্ভুত যুক্তি। তা বিশ্বকর্মা না কী যেন তখন বলছিলে? কী নাকি সব সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড করবে?"

"করবই তো।" বাকোর চোখ নতুন-কেনা মার্বেলের মতো জ্বলজ্বল করে উঠল।

"যেতে দাও একবার বিশ্বকর্মাকে, তারপর পড়া যা একখানা আরম্ভ করব না! সে তুমি ভ্যাবাচাকা খেয়ে যাবে, হুঁ, আমায় জানো না তো!"

বাকোর এসব অসার আস্ফালন শুনে-শুনে হাড়ে দুব্বো গজিয়ে গেছে অনেকদিন। ভাবি, এ-সব কথার জবাব দিলেও ওকে আশকারা দেওয়া হয়। তবু থাকতে পারি না। বলেই ফেলি, "যারা বলে, পরে আরম্ভ করব, তারা কোনোদিন কিছু করতে পারে না। সে পর আর তার কোনোদিন আসে না। পড়াশুনো কি কেউ দিনক্ষণ দেখে আরম্ভ করে!… তা হঠাৎ বিশ্বকর্মাকে নিয়ে টানাটানি কেন?"

"বিশ্বকর্মাকে নিয়ে সবাই টানাটানি করে, কেবল তুমিই

করো না।" বাকো একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে তেতে উঠে বলল, "তোমার থেকেও বুড়ো লোক, ওই যে গো মাঠের ধারে বাড়ি, আমার সুতোর হাত্তা মেরে মেরে ওর ছেলের জন্যে জমায়, ওই বুড়োটাও নিজে খেলে, মাঠে এসে আবার ঝগড়াও করে। তোমারই খালি বাড়াবাড়ি। আকাশের দিকে একটুও তাকাও না।"

"কেন, তাকাব কেন ? কী আছে আকাশে ?"

"আকাশের দিকে না তাকালে আকাশে কী থাকে কেমন করে বুঝবে !"

অতএব আকাশের দিকে তাকালাম। অসংখ্য ঘুড়ি আকাশটা রঙিন করে রেখেছে।

বাকো বলল, "কী দেখলে ? একবারে টেক্‌নিকালার, তাই না ?"

"হ্যাঁ রে, তাই তো। ভারী সুন্দর লাগছে। আমার নিজেরই তো ইচ্ছে করছে ওড়াতে।"

এ-কথায় বাকো একেবারে গলে গেল। হঠাৎ কাঁধের দু'পাশের ডানা দুটি আকাশের দিকে তুলে বাকো 'ওয়ে, ওয়ে, ওয়ে' বলে গোটা বারান্দাটা নেচে গেল।

॥ ২ ॥

বিশ্বকর্মার ঠিক দু'দিন আগে বাকো আমাকে বলল, "দেখো বাবা, মা জিজ্ঞেস করলে তখন আবার উল্টোপাল্টা বলে বোসো না। বলি, নিজের চোখেই তো দেখছ আমি সেই তখন থেকে পড়াশুনো করছি।"

পড়াশুনো ? পড়াশুনোই বটে ! নিজের চোখেই দেখলাম ঘরময় ঘুড়ি ছড়ানো, এখানে-ওখানে ব্লেড, সুতোভর্তি গোটা তিনেক লাটাই পরপর কোচের ওপর খাড়া খাড়া করে দাঁড় করিয়ে রাখা, একটা আঠার টিউব, এ-সবের মাঝখানে একখানা পারিজাত রিডার, বাকো নিবিষ্ট ভাবে একটা এক-তে ঘুড়ির কল খাটাচ্ছে।

"পড়ছ ? পড়ছ কোথায় ? ঘুড়ির কল খাটাচ্ছ তো !" আমি একটু অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালাম।

"পড়ছি কোথায় ?" বাকো তেমনি নিবিষ্ট মনে ঘুড়ির কল খাটাতে-খাটাতে বলল, "পড়ছি কোথায় ? কেন, পারিজাত রিডারটা কী করতে আছে ? কল খাটাচ্ছি সেটা ঠিক, আবার পড়ছিও। কবিতা পড়া হচ্ছে, বুঝলে ? কবিতা পড়ছি মনে মনে, কলও খাটাচ্ছি। বুদ্ধি থাকলে দুটোই একসঙ্গে করা যায়। যাক, তোমাকে আর এব্যাপারে মাথা ঘামাতে হবে না। একটা কাজ করে দেবে কি ? তুমি তো বেশ সাজিয়ে-গুছিয়ে কথা বলতে পারো। মা তো বলে, তোর বাবার কথা ছাড়া আর কিছু নেই। বলি, মাকে কি দয়া করে এটুকু বলে দেবে যে, তোমার ছেলে খুব পড়ছে ?"

"মনে মনে ?"

"ওই দ্যাখো ! ঠাট্টা করছে ! 'মনে মনে' কথাটা বাদ দেবে, শুধু পড়ছি—এটা বলবে। কী বুঝলে ? শিখিয়ে-পড়িয়ে নিলেও তুমি মায়ের সামনে ভুল করবেই। মাকে অত ভয় খাও কেন ?"

"তুই খাস কেন ?"

"আমাকে যে একবার স্টেনলেস স্টিলের গেলাস ছুঁড়ে মেরেছিল। যখন আমি খুব ছোট ছিলাম, তখন আমার দুধের দাঁত ভেঙে দিয়েছিল। কিন্তু তুমি কেন ভয় খাও ?"

আমি ডানহাতখানা তুলে ধমক দিলাম, "মারব গালে এক চড় !"

"যাক গে, সে তোমার ব্যাপার। আমার যে সুতো আছে, তা গতবছরের। ও-সুতোয় এবার চলবে না। ওতে ফেত্তা পড়ে গেছে। বড়জোর ঢিল-প্যাঁচ চলতে পারে। বিশেষ করে রেমোটা এবার আমায় ছাড়বে না। আরবারে আমি ওর দশ-দশটা ঘুড়ি ঘ্যাচঘ্যাচ করে কেটেছি। এবারে ওরা বাড়িসুদ্ধ এককাট্টা হয়েছে বদ্‌লা নেবে বলে। পেটো-ফেটোও অনেক কিনেছে। কাঁসরঘণ্টা-পার্টি ফিট করেছে। আমাকে শম্ভা, ওদের বাড়ির চাকর যে আমার সুতোর টিপ্‌নি দেয়, সে বলেছে। ওরা নাকি 'ছ'হাজার' সুতো কিনেছে। জেবিকটই দু'হাজার, বুঝলে ?"

"জেবিকট ? সেটা আবার কী ?"

"এ মা ! এত বড় একটা লোক, জেবিকট জানে না। জেবিকট একটা সুতো, বুঝলে ? যেমন গান, বর্ধমান—এইসব। আমি কিনেছি চিল। সবচেয়ে শস্তা। সবচেয়ে শক্ত সুতোর নাম জানো ? চেন্ ?"

"চেন্ ? তাতে কী হয় ? সেটা কিনলে না কেন ?"

"কিচ্ছু জানে না। গোরুর দড়ি গো। সুতো নয়। ওসব যারা দেড়-তে, আড়াই-তে ঘুড়ি ওড়ায়, তারা কেনে।"

"তুমি কী-তে ওড়াচ্ছ ?"

"কেন, এক-তে, যা সবাই ওড়ায়। ক'খানা কিনেছি ? বেশি এবার হল না। ওই বারকাপ্পা-টাপ্পা নিয়ে গোটা তিরিশ। যাও, যাও, আমার এখন বিস্তর কাজ। পড়াও করতে হবে, আবার মেরামতও করতে হবে। কান্নিক মারতে হবে। বিকেলে সাইকেলটা দিও তো বাবা।"

"কী করবে ?"

"দত্ত লজ থেকে ভাবছি আরও খানকতক ঘুড়ি না আনতে হয়। দেরি করলে পরে আর পাওয়া যাবে না। বিশ্বকর্মার দিন তো পড়া হবে না। ভাবছি আজ থেকে বিকেলগুলো নষ্ট করব না। খালি পড়ব। খালি পড়াশুনো।" বলে বাকো ওর দুষ্টু-মিষ্টি হাসিটা ঘাড় ঘুরিয়ে আড়াল করল। তারপর ব্যালকনি থেকে রেমোদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ রাগে গর্‌গর্ করে উঠল, "রেমো ! নন্তিদি ! পরশু এ-রকম সময় দেখ লেঙ্গা।"

॥ ৩ ॥

বিশ্বকর্মার আগের দিন সারা দুপুর বাকো ওর শিষ্যদের নিয়ে সুতোয় মাঞ্জা দিয়েছে। যা ক'দিন বৃষ্টি নেবেছে, আকাশের হোসপাইপ থেকে পাগলের মতো জল পড়েই যাচ্ছে, যেন হুড্রু ফলস্। বাকোর মা সব কথায় বলে, 'সব্বোনেশে।' বাকোও বলল, "কী সব্বোনেশে বৃষ্টি রে বাবা ! বছরে মোটে তো একটা দিন বিশ্বকর্মা। সেই একটা দিনও যদি মনের আশ মিটিয়ে ঘুড়ি ওড়াতে না পারি তবে ভগবান আছেন কী করতে ? ছোট ছেলেদের জন্যে ভগবান নয়, ওটা বেশ বুঝতে পারছি।"

বাকো ওর শিষ্যদের নিয়ে এরকম যখন গজগজ করছে, তখন ভগবান তা নিজের কানে শুনতে পেয়ে মেঘের ভেতর যে মস্ত-মস্ত কালো-কালো হাতি আছে না, যারা শুঁড়ে করে

জল ছাড়ে, তাদের সকলকে জল ছাড়তে মানা করে দিলেন। বলে দিলেন, ওরে, আর জল ঢালিস না। বাকোর খুব অসুবিধে হচ্ছে রে। ওরে—

সেইজন্যেই রোদের আভা একটু যেন দেখা গেল। বলতে কী, কালো-কালো মেঘের ফাঁকে এক-আধটুকরো নীলও দেখা গেল। বাকোর দল নীল দেখে 'হুর্-রে, হুর্-রে' বলে পাড়া মাথায় করল।... গতবার কাচগুঁড়ো নিয়ে এক সমস্যা হয়েছিল। এবার বাকো গোড়া মেরে কাজ করেছে। বাড়ির সামনে টালির ভাঙা ঘরখানায় কাচের তিনটে বাজে টিউব যে পড়ে আছে, এক ফাঁকে বাকো তা দেখে নিয়েছিল। ওগুলো নিয়ে বাকো গুঁড়ো করতে বসে যায় বেশ একটু আগে থেকেই। গোটা পাড়ায় অন্তত দশ-বারোটা বাড়ি। তাতে অন্তত জনা তিরিশেক ছেলে। সবাই বসে গেছে হামানদিস্তে নিয়ে। সবাই দুম্‌দুম্ করে কাচ গুঁড়ো করছে। কারটা কত মিহি হল, দেখে নিচ্ছে। কে কতখানি করল হিসেব নিচ্ছে। তারপর খবরের কাগজের ছোট-ছোট প্যাকেট করে তাতে ঢেলে রাখছে। যা হোক, কাচগুঁড়ো এবার অনেকটাই হয়েছে। প্রদোষদা চাইতে এসেছিল। বাকো দিয়ে দিয়েছে খানিকটা। প্রদোষদা কাচগুঁড়ো নিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে চলে গেল না। বলল, "হ্যাঁ রে বাকো, তুই তো বারান্দা থেকে ঘুড়ি ওড়াস, এ-পাড়ার কেউ যা পারে না। অনেকে বলে, তুই নাকি ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও চেঁচাস, 'ডবল প্যাঁচ! দোস্‌রা ঘুড়ি খেল কে! এই, এই ছোটন—লট্‌কা, লট্‌কা, না হলে হাত্তা মার।' হ্যাঁ রে, এসব সত্যি?"

বাকো কী আর বলবে প্রদোষদাকে! প্রদোষদা কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে, আর বাকো মোটে ক্লাস এইটে। হঠাৎ প্রদোষদাই বলল, "তুই তো নানারকম মাঞ্জা জানিস, একটা বল্ না!"

প্রদোষদার এই কথায় বাকোর বুক গর্বে, আনন্দে ফুলে উঠল। প্রদোষদা তো আরও অনেকের কাছে জানতে যেতে পারত, অনেকেই ভাল ঘুড়ি খেলে, কিন্তু তাদের কাছে যায়নি প্রদোষদা, তার কাছেই এসেছে। সুতরাং বাকো, যা কখনও করে না, বিশেষ করে আর মাত্র দুটো দিন যখন সামনে, এই সময় ট্রেডসিক্রেট কেউ আউট করে না, বাকো তাও প্রদোষদাকে আউট করে দিল। বলল, "স্কুলের গেটে সেই কড়ে-আঙুল-বাঁকা যে বুড়োটা চিট আর কারেন্ট বেচে, আমি তার জিনিস মাঝে-মাঝে বেচে দিয়ে সাহায্য করে এই মাঞ্জাটা হাত করেছি। তোমাকে বলেই বলছি প্রদোষদা। তুমি কিন্তু কাউকে বলে দিতে পারবে না। বিশেষ করে ওই রেমোটা আর ওর নন্তিদিকে। শোনো বলি। কিন্তু খবরদার, কাকপক্ষী যেন টের না পায়।"

তারপর বাকো গলা নামিয়ে ফিসফিস করে প্রদোষদাকে ওর ট্রেডসিক্রেট আউট করল। কাকুতিমিনতি করে ফের বলল, "তুমি কলেজে পড়ো। আমি মোটে ক্লাস এইটে। আমার কাছে তুমি কিরে কেটেছ, বলেছ বলবে না রেমোকে। এ-কথাটা মনে রেখো। পরশু মহারণ।"

॥ ৪ ॥

কাল বিশ্বকর্মা। রোদটা মোটামুটি উঠেছে। বাকো ওর শিষ্যদের নিয়ে মাঠে নেমে গেল আগেভাগে। না হলে অন্যরা

মাঠ দখল করে নেবে। মাঠের এখানে-ওখানে জল জমে আছে। তা হোক, দু'দিকের দুটো বারপোস্ট এখনও খালি পড়ে আছে। একজন রিলের সুতো ছাড়তে ছাড়তে সামনে এগিয়ে গেল, আর একজন কচুপাতায় রাখা মাঞ্জা খাইয়ে খাইয়ে যাচ্ছে। পেছনে যে আছে, সে টিপ্‌নি দিচ্ছে। অত সুতো মাঞ্জা দিতে দিতে, টিপ্‌নি দিতে দিতে একসময় হাত ভেড়ে যাবে। বাকো তখন ম্যানেজ করবে। এখন সে নিজে করছে না কিছু। শুধু তদারকি করছে। জলভর্তি গোটা মাঠে শুধু বাকোর আওয়াজ, তার শাসানি, আদরমেশানো ধমকের শব্দ ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। খানিকটা মাঞ্জা খেয়েছে সুতোটা, হঠাৎ সুতো দিয়ে বারপোস্ট-ঘেরা জায়গাটায় একটা ষাঁড় ঢুকে গেল। কী আপদ! "ওরে, তাড়া, তাড়া," বাকো লাটাই ফেলে ভাঙা ইঁট নিয়ে পাগলের মতো ষাঁড়টাকে তাড়া দিল। ততক্ষণে যেটুকু সর্বনাশ করবার, ষাঁড়টা তা করে ফেলেছে। জট পাকিয়ে গেছে সুতোতে। গিঁট পড়ে গেছে। "সর্বনাশ হয়ে গেল, সর্বনাশ হয়ে গেল!" বাকো ওপরের দিকে তাকিয়ে আমাকে দেখে বলল, "কী করছ ওপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে? ষাঁড়টাকে তাড়াতে পারো না!"

"কোন ষাঁড়টাকে?"

বাকোর জবাব দেবার মেজাজে তখন মরচে পড়ে গেছে। ও যখন শিষ্যদের নিয়ে কপাল চাপড়ে 'হায় হায়' করছে, তখন ষাঁড়টা আবার ঢুকে, ট্রায়াল দেবার জন্যে যে একখানা পেটকাটি মাঠে রেখেছিল, সেটা রঙিন দেখে, খচমচ করে খেতে লাগল। বাকো পাগলের মতো ছুটে এসে দমাদ্দম পেটাতে লাগল। মারছে আর বলছে, "মাঠে এত ঘাস আছে, সেদিকে দৃষ্টি নেই। বাচ্ছা-বাচ্ছা ছেলেরা ঘুঁড়ি খেলছে, যত লোভ সেই দিকে! এই অট্‌লা, ওটার জিভটা টেনে ধর তো! আমি ওপর থেকে মায়ের খুন্তিটা পুড়িয়ে আনি। এনে ওর জিভে ছ্যাঁকা দোব। খুব লোভ হয়েছে, অ্যাঁ, খুব লোভ!"

বিকেলের দিকে আমার সাইকেলটা নিয়ে বাকো বার হল। দত্ত লজ থেকে ঘুড়ি কেনা তো আছেই, তা ছাড়া চারদিক দেখতে-দেখতে যাওয়া। কোন্ পাড়াটা কেমন সেজেছে, ওদের ইস্কুলের ছেলেরা, যারা একটু দূরে-দূরে থাকে, তারা কে ক'টা ঘুড়ি কিনল, কে কী মাঞ্জা দিচ্ছে (যদিও বলবে না)—এইসব একটু দেখেশুনে নেওয়া আর কী। যত বাকো সাইকেলে করে এগিয়ে যাচ্ছে, তত অবাক হচ্ছে। বাপ্ রে বাপ্! এ কী কাণ্ড! কোনো গলি বাকি নেই, সব, সকলেই সেজেছে। যেদিকে তাকাও, খালি কাঁটাতারের বেড়ার মতন সুতোর বেড়া। বলতে পারো সুতোর গণ্ডি। বড়-বড় রাস্তাও বাকি নেই। কোনো ইলেকট্রিক পোস্ট খালি নেই। একটা থেকে আরেকটায় সুতো বাঁধা, ঠিক তার পরেরটা থেকে তার পরেরটা, এইভাবে সুতো বাঁধা গোটা শহর। সর্বত্র সেই একই দৃশ্য—একজন রিল ছাড়তে ছাড়তে যাচ্ছে, আরেকজন বাঁ হাতে কচুপাতা, ডানহাতে মাঞ্জা, পেছন-পেছন আর-একজন, সে দিয়ে চলেছে টিপ্‌নি—ওঃ, দেখতে দেখতে বাকোর মাথা খারাপ হয়ে যাবে। কাল যা একখানা জমবে না! হে ভগবান, যদি আজকের এই বিকেলের মতন আকাশের অবস্থা রাখো, যদি এইরকমই একটু রোদ ঢালতে পারো কাল, তাহলে বাকো কী জিনিস, বাকো তা দেখিয়ে দেবে। বাকো মনে মনে রেমোকে উদ্দেশ করে বলল, "ওরে রেমো, যতই দু'হাজার দশহাজার সুতো কিনিস, যতই মোমঘুড়ি কিনিস, আর যতই মাঞ্জা দিস, আসল হচ্ছে খেলাটা। লাটাই নিয়ে শুধু ডান হাত আর বাঁ হাত করা। ছোটাছুটিও করতে হয় না। ফণীদা যেমন করে, আলসের ওপর শুধু একটুখানি জায়গা, একটু এদিক-ওদিক হয়ে গেলে দোতলা থেকে পড়ে গিয়ে একেবারে খতম, কিন্তু এদিক-ওদিক হয় না ফণীদা, শুধু ডান হাত আর বাঁ হাত, লাটাই নিয়ে ঠায় একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে, ব্যস, তাতেই সবাইকে ভোকাটা করে ফণীদা বেরিয়ে আসে। কাল মহারণ। মনে রাখিস রেমো, কাল আমি ভীমসেন, তুই রেমো দুঃশাসন, তোর রক্তপান করব। তবে বাকো ঠাণ্ডা হবে।"

সন্ধের সময় বাকো ওর ঘরে ঢুকল। দিদ্মা যেমন ভক্তি নিয়ে ঠাকুরঘরে ঢোকে, তেমনিভাবে। এ-ঘর যেন যাত্রার সাজঘর। অথবা অস্ত্রাগার। আর-একটু পরে মানে কাল ভোর থেকেই লড়াই। ঘরে যাতে কেউ না ঢোকে, সেইজন্যে বাকো একটা সাদা বড় কাগজে, মায়ের আলতার শ্রাদ্ধ করে, আঙুল ডুবিয়ে ত্যাড়াবাঁকা অক্ষরে লিখেছে—'ঘুড়ি হাউস। যাঁরা ঘুড়ি দেখলে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন, এ-ঘর তাঁদের জন্যে নয়। তাঁরা দয়া করে কাগজ পড়ুন।' বলা বাহুল্য এসব লেখার উদ্দিষ্ট ব্যক্তি আমি। তা ওটা লিখে আঠা দিয়ে জুড়ে ঘরের বাইরের দেওয়ালে টাঙানো হয়েছে। আমাকে নিয়েই যত সতর্কতা। আমি ওকে একটা ডায়েরি দিয়েছিলাম কোনো একদিন। দেখি সেই ডায়েরিটা ঘরের ড্রেসিং টেবিলের ওপর চিত হয়ে পড়ে আছে। কী লিখেছে, দেখবার জন্যে উল্টে দেখছি। দেখি কী, একটা পাতা কালির আঁচড় দিয়ে বাকো দ্বিধাবিভক্ত করেছে। তাতে, ডানদিকে লিখেছে—'আমার কেটেছে', বাঁদিকের মাথার ওপর লিখেছে—'আমি কেটেছি'। প্রথমটা আমি বুঝতে পারিনি। বুঝতে পেরে আমি হোহো করে হেসে ফেলেছি। বাকো ঘরের এক কোণ থেকে চোখ ঘুরিয়ে বলল, "ওসব কী হচ্ছে! দাঁড়াও, মাসুক (মা আসুক)। মা এলে বলব, তুমি আমার ডায়েরি দেখছ। জানো না, এত বড় লোক, পরের ডায়েরি দেখতে নেই! কিচ্ছু বুদ্ধি নেই। একদম ডায়েরি টাচ করবে না। রাখো, রেখে দাও যেমন আছে। ওইজন্যে দরজায় খিল তুলে দিই।"

আমি চলে যেতেই বাকো দরজায় খিল তুলে দিল। তারপর তারস্বরে পড়তে লাগল।

ওর মা রান্নাঘরে ছিলেন, এসে বললেন, "বাকো কী পড়ছে?"

"মনে হচ্ছে সংস্কৃত পড়ছে।"

"সংস্কৃত তো এখন পড়ার কথা নয়। এখন তো ইংরেজি পড়বে। যাও, দেখে এসো, দরজার খিল খুলতে বলো।"

দরজার খিল খুলতে বলতে হল না, আমি কাছে যেতেই স্পষ্ট শুনলাম ও 'জয়ং দেহি, জয়ং দেহি' করে যাচ্ছে একনাগাড়ে। আমি একটু অবাক হয়ে বন্ধ দরজার পাশ থেকে বললাম, "এ কী! এসব কী পড়ছ! এ তো তোমার পড়া নয়।"

বাকো ভেতর থেকে রেগে গিয়ে বলল, "ছাই জানে। দাদু বলেছে এটা দেবভাষা।"

"তা নয় হল। জয় চাইছিস, এসব কি তোর পড়া!"

"ওসব আমি জানি না। বিষ্টি যে করেই হোক থামাতেই হবে। তা দেবতারা তো অন্য ভাষা জানে না। বাংলা চলবে না। হিন্দিও চলবে না। দেবতাদের জানাবার জন্যে আমি দেবভাষা ইউজ করছি। কিচ্ছু জানে না।"

রাত্তিরে উত্তেজনায় কিছুতেই তেমন ঘুম আসছে না। ঘণ্টায়-ঘণ্টায় বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ছে। মায়ের বালিশের তলায় থাকে টর্চ। টর্চটা নিয়ে ঘড়ি দেখবে, তাই যতবার টর্চ হাতড়াতে যাচ্ছে, ততবার মায়ের ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। ওর মা বলছেন, "উঠে দোব ঘা কতক! না হলে শায়েস্তা হবি না! চুপ করে শো!"

ও গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ল। শুয়ে থাকতে পারবে কেন? উত্তেজনায় ছটফট করতে করতে আবার উঠে পড়েছে। আবার সেই সন্তর্পণে বালিশের তলায় টর্চ হাতড়াতে গেছে, অমনি ওর মায়ের ঘুম ভেঙে গেল, ওর মা ওর কানটি ধরে বললেন, "শো, শুয়ে পড় হতভাগা। এটা তো পরে দেখছি চোর-ছ্যাঁচোড় হবে। চোখে একটুও ঘুম নেই। আর পড়তে বসে ভোরবেলায় উঠে, তখন আর দেখতে হবে না, সকাল সাড়ে আটটাতেও চোখ রগড়াবে।"

॥ ৫ ॥

শেষপর্যন্ত ভোরের টাইমে ভোর হল। বাকো ছটফট করছে নীচে নামবার জন্যে। একবার ছুটে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল। মেঘ থম্ ধরে আছে বটে, তবে ভাল দেবভাষা প্রয়োগের ফল ফলেছে। দেবতা শুনেছেন। বৃষ্টি হবে না বলেই বোধ হচ্ছে।

আরও ঘণ্টা-দুই গেল। বাকো তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গেল, তারপর চার-চারটে রুটি উইদাউট চিনি মুখে চালান করে দিয়ে লাটাই নিয়ে মাঠে নেমে গেল। ওকে দেখে বললাম, "কী রে, এত তাড়াতাড়ি?"

ওর মুখে রুটি পোরা, কী যে বলল, বোঝা গেল না। শুধু মাঠ থেকে ওর গলার আওয়াজ পেলাম, বোধহয় রেমোদের

উদ্দেশ করে বলছে, "আমিই প্রথম ওপেন করছি ! তোরা ঘুড়ি বাড় সাহস থাকলে ! চ্যালেঞ্জ !"

কিন্তু প্রথম চোটেই বাকোর ঘুড়ি কেটে গেল। আমি সব শুনতে পাচ্ছি ঘরে বসে। আজ আমারও ছুটি। কী আর করব, একটু ঘুড়ি-খেলা দেখছি। বাকোর ঘুড়ি কেটে যেতে শুধু রেমোদের বাড়ি থেকেই নয়, অন্য-অন্য বাড়ির ছাদ থেকেও 'ভোকাটা, ভোকাটা, বাকো, ওয়ে, ওয়ে, ওয়ে' এরকম ভাষার একরাশ উল্লাস এসে বাকোকে যেন বুলেটের মতো ঝাঁঝরা করে দিল। মাঠের উত্তেজনা দেখছি আমাকেও ছুঁয়ে ফেলেছে। আমি তাড়াতাড়ি কাগজ ফেলে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালাম। গোটা আকাশের কোথাও আর একচিলতে জায়গা খালি নেই। উঁচুতে, নিচুতে, ডাইনে, বাঁয়ে, পুবে, পশ্চিমে—শুধু ঘুড়ি আর ঘুড়ি। কত রকমের রং আর কত রকমের নকশা। থেকে-থেকে হল্লা উঠছে দূরে, কাছে, কোথাও কাঁসর-ঘণ্টা বাজছে, কোথাও ফাটছে পেটো। সব ওই ঘুড়িকে লক্ষ করে। মাঝে-মাঝে এক-একটা ঘুড়ি হাওয়ার টানে দক্ষিণের দিকে উড়ে যাচ্ছে, আর অমনি লগা হাতে ছুটছে ছেলের দল পিলপিল করে। এ-বাড়ির কার্নিস, ও-বাড়ির ছাদ, সে-বাড়ির আলসে, ইলেকট্রিকের তার, গাছের মাথা—সব জায়গায় গিয়ে পৌঁছচ্ছে লগা। লটকে নামিয়ে আনছে সুতো। কোথাও কাটাছেঁড়া ঘুড়ির দখল নিয়ে হাতাহাতি করতে করতে শেষপর্যন্ত প্রত্যেকের ভাগে জুটছে এক-একটা টুকরো কাগজ।

"এই বাকো," চাঁদুদা পাশে-পাশে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে খেলতে-খেলতে বললে, "বাকো রে, ঘুড়ি সামলা। হাতগোড়া মারব।"

"মারো না হাতগোড়া। অত সোজা নয়। হাহা।" বাকো প্রবল আত্মবিশ্বাসে হাহা করে হাসল। কিন্তু ঘুড়িটা বাকোর কেটে গেল এবারেও। আমি ওপর থেকে দেখছি, বাকো মনমরা হয়ে লাটাই গোটাচ্ছে। লাটাই গুটিয়ে বাকো অন্যদের খেলা দেখতে লাগল। হঠাৎ গোপাল চেঁচিয়ে উঠল রায়েদের তেতলা থেকে, "ওরে রতন, ক'হাজার ড্যাঁড়স চিবিয়েছিস ? ওই দ্যাখ, ভুতোর ঘুড়ি থাম্বা মারছে। লাট খাওয়া, লাট খাওয়া !"

বাকো নিজের সদ্য-কেটে-যাওয়া ঘুড়ির শোক ভুলে, গলা অসম্ভব বাড়িয়ে, যেদিকে ভুতো খেলছে, সেদিকে আওয়াজ ছুঁড়ে দিয়ে বলল, "যত ইচ্ছে লাট খাওয়াক। ভুতোদা, তুই উল্টো লাটাই চালা। ভুতোদা, যা বলছি কর, উল্টো লাটাই।"

বাকোর এখন ঘুড়ি কাটা যাচ্ছে বটে, কিন্তু সকলে জানে, বাকো ঘুড়ির ব্যাপারে ছোটখাটো একজন অথরিটি, তাই ভুতো বাকোর কথা শুনে উল্টো লাটাই চালিয়ে নিজের ঘুড়িটাকে ঢল খাইয়ে নামিয়ে আনল।

বাকো হাততালি দিয়ে বলল, "মার খিচ !" আর সত্যি সত্যি তাই শুনে ভুতো এক বোম্বাই খিচ মারলে। রতনের ঘুড়ি ভোকাটা হয়ে গেল।

বাকো আর অন্য সবাই, রতনকে যারা ঠিক পছন্দ করে না, তারা দুদিকের ডানা তুলে, 'ওয়ে, ওয়ে, ওয়ে' করে মাঠময় নেচে নিল। কে যেন চেঁচিয়ে বলল, "রত্না, বাড়ি যা !"

কিন্তু বাকো নিজে তেমন সুবিধে করতে পারছে না এবার। দেখতে দেখতে বেলাও বাড়ছে। রোদও বাড়ছে খুব। রোদ যেন এই একটা-দেড়টার সময় কামড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে পৃথিবী আর মানুষের চামড়া। বাকোর মা ডাকছেন, "ওরে চলে আয়, ভাত খেয়ে যা ! থালা সাজিয়ে বসে আছি। গিলে উদ্ধার কর্।" কে শোনে কার কথা ! পরপর অনেক ঘুড়ি কাটা গেছে বাকোর। ওর রক্ত এখন মাথায় উঠে গেছে। কিছুতেই ও এবারে যেন সুবিধে করতে পারছে না। আর ওই রেমোর দিদি নন্তিদিটাও হয়েছে তেমনি। এক-একটা ঘুড়ি কেটে যাচ্ছে বাকোর বা অন্য কারুর, সঙ্গে-সঙ্গে কী পাজি দিদিটা, পেটো ফাটাচ্ছে ! কী দস্যি ! আর বলছে, "বাকো, বাড়ি যা। বাড়ি যা। গেলবারের শোধ তুলব সুদে-আসলে।"

"ওই, বাকোর আবার কাটা গেল। ভোকাটা। ভোকাটা।" গোটা মাঠ হই-হই করে উঠল। কাঁসর-ঘণ্টা বাজাচ্ছে রেমো, 'কাঁই নানা, কাই না, ডুডুম ডুডুম ডুম !' মুখে-মুখে বাজাচ্ছে ঢাকের কাঠি।

এক-একটা ঘুড়ি কাটা যাচ্ছে আর বাকো লজ্জায়, অপমানে মুখ নিচু করে প্যাভিলিয়নে অর্থাৎ ঘরে ফিরে আসছে। ফিরে এসে কল-খাটানো ঘুড়ি নিয়ে আবার ফিরে যাচ্ছে মাঠে। নতুন করে শপথ শানাচ্ছে। দাঁতে দাঁত ঘষছে। কিন্তু সবই ভস্মে ঘি ঢালা এবার। শপথ বা প্রতিজ্ঞা, এ-সব কোনো কাজেই আসছে না।

ঘুড়ির কোনো দোষ নেই। সব গণ্ডগোল করে দিয়েছে ওই ষাঁড়টা। বাকোর মনে হল, এ নিশ্চয় রেমোদের কারসাজি। ওই দুষ্টুমি করে ষাঁড়টাকে মাঠে ঢুকিয়ে দিয়ে বাকোকে জব্দ করতে চেয়েছে। দাঁড়াও, খবর নিতে হচ্ছে ওদের চাকর শম্ভার কাছ থেকে। বাকোর মা সমানে ডাকছেন, আমি সমানে ডাকছি, কিন্তু বাকোর কোনো হুঁশ নেই, ও খেলেই যাচ্ছে, খেলেই যাচ্ছে, তারপর একসময় তাড়াতাড়ি এসে কোনোরকমে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাত খেয়ে মাঠে আবার দে ছুট।

সারাক্ষণই মাঠে আমার চোখ ছিল, কিন্তু হঠাৎ একটু

স্নেহ
নিমেষে গুলে যায় এমন স্কীমড্ মিল্ক পাউডার
স্নেহ স্কীমড্ মিল্ক পাউডার। শুধু জলে দিলেই হ'ল...নিমেষে গুলে যায়! গরম জল দরকার নেই। দলা পাকায় না। কোনো ঝঞ্ঝাট নেই। পুষ্টিতে ভরা কম চর্বিযুক্ত এই দুধ সরাসরি ব্যবহার করুন—চা বা কফি, দই বা মিষ্ঠান্ন বানানোর জন্যে।
স্নেহ স্কীমড্ মিল্ক পাউডার। পুষ্টিগুণে ভরা এই সুবিধাজনক প্যাক হাতের কাছে রাখুন।
Sneha
SKIMMED MILK POWDER
Spray Dried ☐ Instantly Soluble
স্নেহ-প্রকৃতির সস্নেহ উপহার!
মধ্য প্রদেশ দুগ্ধ মহাসংঘের উৎকৃষ্ট ডেয়ারী উৎপাদন

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম যখন ভাঙল, তখন রোদ প্রায় পড়ে এসেছে। উঠে দেখি পাশের ঘরে বাকো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা এক-তে ঘুড়ি মাথায় ঘষে চেত্তি ভাঙছে। আমি বললাম, "কী হয়েছে ?"

বাকো বোধহয় শুনতে পেল না। ওর চোখ দুটো উত্তেজনায় দপদপ করে জ্বলছে। ও অস্থিরভাবে ঢাকা বারান্দার এদিক থেকে ওদিক হেঁটে গেল। তারপর হাতের চেটোতে একটা ঘুসি মেরে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "হয়েছে !"

"কী হয়েছে ?"

"ব্যালকনিতে দাঁড়াও। তাহলে দেখতে পাবে।" বলে তরতর করে নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে। তারপর দূরের আকাশে যেখানে পরপর চার-চারটে ঘুড়ি রঙিন টিকিটের মতো দাঁড়িয়ে গেছে, বাকো সেই দিক লক্ষ করে ওদের মাথা টপকে নিজের ঘুড়িটাকে তুলে দিল। এরপর শাঁ করে গোঁত্তা খাইয়ে নিজের ঘুড়িটাকে ওদের ঘুড়িগুলোর ঠিক তলায় এনে দাঁড় করালে। নামিয়ে আনতে না আনতেই চাঁদুদা চেঁচিয়ে বলল, "বাকো, খত্‌রা।" সঙ্গে সঙ্গে বাকোর হাতের কারসাজিতে ওর গোঁত্তা-খাওয়া ঘুড়িটা ওপরের দিকে ফর্‌ফর্ করে ফুঁড়ে উঠল। গোটা মাঠের যে যেখানে দাঁড়িয়ে ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল, ওদের হাতে লাটাই ধরা আছে বটে, কিন্তু ওদের সকলের চোখ চলে গেল বাকোর দিকে, একটা যেন 'কী হয়, কী হয়' ভাব। এমন উত্তেজনাময় মুহূর্ত যে কেউ কোনো কথা বলতে বলতে পারছে না। বাকো দাঁত কড়মড় করে বলল, "পঞ্চা, লাটাই ধর্।" বলেই বাকো হুঙ্কার দিয়ে উঠল, "খত্‌রা টালা !" তারপর চড়চড় করে এক হ্যাঁচকা টানে পরপর চার-চারটে ঘুড়ি কেটে দিল। কাটার সঙ্গে সঙ্গে গোটা মাঠ, যারা এই মুহূর্তটির জন্যে অপেক্ষা করছিল, তারা হই-হই করে উঠল।

"সাব্বাশ বাকো, জিন্দাবাদ ! শাবাশ বাকো, জিন্দাবাদ ! জিতল কে, আমাদের বাকো। হারল কে, রেমোরা। দুয়ো দুয়ো রেমো, রেমো ! জিও জিও বাকো, বাকো।" তারপর তো বাকোকে কাঁধে নিয়ে সেই 'ওয়ে, ওয়ে, ওয়ে' চিৎকার আছেই।

"এই যে ঘুড়ি-ইউনিভার্সিটির উপাচার্য," বলে স্বয়ং প্রদোষদা এগিয়ে এসে বাকোকে কনগ্র্যাচুলেশন জানাল। বলল, "এর কোনো জবাব নেই।"

ওই অন্ধকার নামছে। ছাইরঙে ছেয়ে যাচ্ছে আকাশ। হাসাহাসি, মাথা ফাটাফাটি, চ্যালেঞ্জ, পাল্টা চ্যালেঞ্জ, দুয়োক্কো আর ভোকাটা শব্দে এতক্ষণ ভরেছিল দস্যি সকাল, দামাল দুপুর আর রক্তাক্ত বিকেল। ছাইরঙের পাতলা মাঞ্জার মতো অন্ধকার এখন ধুইয়ে দিচ্ছে আকাশের ক্ষত। রুখোমাটিতে লবণ-ঘাম ঝরিয়ে এখন ঘরে ফেরার পালা। শেষ, ঘুড়ি-লড়াই শেষ। যারা এতক্ষণ আকাশের জমি জবরদখল করে ছিল সেইসব জঙ্গিসেনারা এখন সুতো গুটিয়ে নিচ্ছে। দু'একটা করে ছেঁড়া ঘুড়ি, আম জাম বাঁশঝাড়ের মাথার ওপর দিয়ে শাঁ শাঁ করে মথিত আবেগে গঙ্গার দিকে ছুটে চলেছে। বিধ্বস্ত, ক্লান্ত, অশ্রুময়, অহঙ্কারী, অভিমানী, কিশোরের দল এই নষ্টরোদে ছড়িয়ে পড়েছে যে যার গলিতে।

বাকোও ফিরে আসছে। সেও ক্লান্ত বটে, তবু ওর মুখে মোমঘষা ঝকঝকে এক দুর্লভ হাসি, রাঙা চেরিফলের মতো দুই আরক্ত গাল এখন যদিও রোদের আঁচে বেগুনপোড়া, তবু তাতেও খেলে যাচ্ছে আনন্দের টোল। হলুদ হয়ে গেছে চোখের জমি, তবু তাতেও ফুটে আছে গভীর তৃপ্তি। ওর প্রায় সব ঘুড়ি কাটা গেছে এ-কথা ঠিক, তবু অদম্য ও নির্ভীক বাকো অসীম ধৈর্যে আর অনবদ্য কৌশলে ওর ভাষায় 'চ্যাড়চ্যাড়' করে পরপর চার-চারটে ঘুড়ি কেটে নিজের শেষ ঘুড়িটাকে সম্পূর্ণ অটুট রেখেই মাটিতে যে নামিয়ে আনতে পেরেছে, এ কম কথা নয়। হারতে হারতে প্রায় সর্বস্বান্ত হয়েও শেষ পর্যন্ত ও জ্বলে উঠতে পেরেছে। আর শেষ মরণপণ যুদ্ধে ও জয়ী হয়েছে। ওই ও ঢুকে পড়ল ঘরে। সিঁড়ি ভেঙে উঠছে উপরে। আমি সব টের পাচ্ছি। এইবার রণক্লান্ত বাকো ওর মাকে বলবে, "মা, ও মা, তোমার ছেলেকে খেতে দাও ! ও মা, ও অন্য ছেলের মা।" 'অন্য ছেলের মা' বলে ও ওর মাকে খেপায়।

কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, বাকো সে-সব কিছুই করল না। আমি ওপাশের জানলা দিয়ে দেখছি, ও মাঠের ধারের ব্যালকনিতে বসে বিনা ধরাইয়ে (যেটা ওর বিশেষত্ব) মোটা-মোটা রেলিঙের ভিতর দিয়ে সুতো ছেড়ে দিয়ে বসে বসে একটা সাদা ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। আকাশে এখন অন্য ঘুড়ি নেই। শেষ ঘুড়ি শেষ টান দিয়ে শেষবারের মতো সকলে নামিয়ে নিয়েছে। এ-সময় আবার বাকো ঘুড়ি ওড়ায় কেন ? ওর লড়াই কি এখনও শেষ হয়নি ? আমি একটু রেগে গিয়ে কাছে এসে বললাম, "এখনও খেলছ ? এখনও তোমার মাতন শেষ হল না ? আর, আর কত খেলবে ?"

বাকো আমার দিকে ফিরে তাকাল না। ঘুড়িটাকে কসরত করে আকাশের মাথায় তুলে ও ওইদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বলল, "এতক্ষণ খেলছিলাম সকলের সঙ্গে। এবার খেলছি একটু একা-একা। এ-খেলায় হারজিত নেই। দুয়োক্কো নেই। ভোকাটা নেই। এখন শুধু আপনমনে মনের সুখে ঘুড়ি ওড়ানো। অন্ধকারে কী সুন্দর উড়ছে সাদা ঘুড়িটা, তাই না বাবা ? মজা দেখছ, এখন কিন্তু কোনো কাঁসরঘণ্টা বাজছে না, কেউ পেটো ফাটাচ্ছে না, ওয়ে ওয়ে বলছে না ! আমার কী মনে হয় জানো ?"

"কী ?"

"মনে হচ্ছে আকাশটাই আমার সত্যিকারের ঘরবাড়ি।" বলে ও অলৌকিক, পবিত্র, শান্ত মুখে আমার দিকে তাকাল। বলল, "আর আমি কী জানো ? আমি ওই সাদা ঘুড়িটা। সত্যি সত্যি তাই যদি হত বাবা, তাহলে কী মজাই না হত ! তা হলে পড়ার জন্যে মা স্টেনলেস স্টিলের গ্লাস ছুঁড়ে মারতেও পারত না। বাবা, তুমিও বকতে পারতে না আমায়।"

আমি ওর কথায় মুগ্ধ হতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তা হলে তো ওকে বড্ড বেশি আশকারা দেওয়া হয়ে যায়। সঙ্গে-সঙ্গে তাই আমি কঠিন শাসনের সুরে বললাম, "ঢের হয়েছে। তাড়াতাড়ি ঘুড়ি, লাটাই রেখে, হাত-পা ধুয়ে পড়তে এসো। সেই তখন থেকে আমি পারিজাত রিডার সাজিয়ে বসে আছি। শিগগির, বি কুইক।"

বাকো ঘাড় ফিরিয়ে, সেই দুষ্টু হাসি হেসে বলল, "পড়তে আমার বয়েই গেছে !"

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

অর্থ জানো

অবিমৃশ্যকারী

বাংলা ভাষার একটি বড় সম্পদ হল সংস্কৃত শব্দ। তোমরা জানো, সংস্কৃত ভাষাই বাংলা ভাষার জননী। বহু সংস্কৃত শব্দ ভাষার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বা উচ্চারণের দোষে বাংলায় কিছুটা নতুন রূপে প্রবেশ করেছে। হস্ত আর চন্দ্র থেকে আমরা হাতে চাঁদ পেয়েছি। সূর্যকে সুয্যি বলে ডেকেছি আমরা। তবু চন্দ্র সূর্য আগের মতোই ঠিক আছে। এই চন্দ্র সূর্যের মতো অসংখ্য সংস্কৃত শব্দ বাংলা ভাষায় অবিকৃত রূপে আছে, আর সেই শব্দের প্রয়োগে সৌন্দর্যে ও ঝংকারে বাংলা ভাষা উজ্জ্বল। নীচের প্রতিটি সংস্কৃত শব্দের পাশে কয়েকটি আনুমানিক অর্থ দেওয়া আছে। যেটি ঠিক মনে হবে তাতে দাগ দেবে। সবশেষে উত্তর মেলাবে।

১। **গুণগ্রাম**—(ক) যে গ্রামে গুণী ব্যক্তিদের বাস, (খ) একটি বিখ্যাত গ্রামের নাম, (গ) গুণাবলি (ঘ) গুণবন্ত গ্রাম।

২। **অপাঙ্গ**—(ক) নয়নকোণ, (খ) নিকৃষ্ট কোনো অঙ্গ, (গ) ক্ষুদ্র অঙ্গ, (ঘ) চোখ।

৩। **অবিমৃশ্যকারী**—(ক) যে কঠিন কর্মে দক্ষ, (খ) মিথ্যা কথায় ওস্তাদ, (গ) দুঃসাহসী, (ঘ) যে বিবেচনা না করে কাজ করে।

৪। **ব্রততী**—(ক) ব্রতচারিণী, (খ) লতা, (গ) স্ত্রীলোকের নাম, (ঘ) গাছের ডাল।

উত্তর—১। (গ) গুণাবলি। এখানে গ্রাম শব্দের অর্থ হল সমূহ। যেমন—বিদ্যাসাগরের অশেষ গুণগ্রাম।

২। (ক) নয়নকোণ অর্থাৎ আড়চোখ। যেমন—'অপাঙ্গে বিলোল কটাক্ষ স্ফুরিত করিয়া ঘৃতাচী কহিল' (পরশুরাম)।

৩। (ঘ) বিবেচনা না করে কাজ করে অর্থাৎ অবিবেচক বা হঠকারী। যেমন—অবিমৃশ্যকারীর দুঃখই লাভ হয়। এর মূলে আছে মৃশ্ ধাতু, যার অর্থ বিবেচনা করা।

৪। (খ) লতা। যেমন—পল্লবিত ব্রততীর মতো।

দেব-সেনাপতি

সহজে ইংরেজি

পাতালে কয়েক মিনিট

ফুটপাথ থেকে সিঁড়ি নেমে গেছে পাতালের দিকে। মিলির মনে হল, তলায় গিয়ে কী দেখব কে জানে! কয়েক ধাপ নেমে দেখল, দাদা ঠিক তার পেছনে, তার পরে বাবা আর মা। সঙ্গে-সঙ্গে তার মনে হল, উঠবার সময়ে এতগুলো সিঁড়ি বাবাকে উঠতে হবে? ডাক্তার যে বাবাকে বেশি সিঁড়ি উঠতে বারণ করেছেন?

Almost half-way down there were the ticket-windows. Mr. Roy went to one of the windows. A man in uniform was selling the tickets. Mr. Roy got the tickets and joined the others who were waiting at the turnstile. They went through it and started their climb down again. When they reached the platform they found only a handful of passengers. One or two were eagerly looking up the track. There was a uniformed official on the platform. In answer to Mr. Roy's question he said, a train for Esplanade would come along in a few minutes.

So they had a few minutes to look around.

"It's really nice down here, isn't it, Daddy?" Milly said.

"Not bad, not bad at all," agreed Mr. Roy.

Mrs. Roy said, "It's clean."

Mr. Roy said, "It *is* clean. No question about that."

Chambal said, "I've seen dirtier station-platforms."

Mr. Roy said, "They do seem to take good care of the station. I hope they can keep it this way."

Mrs. Roy said, "They *can*, if they want to. The question is, will they *want* to?"

একটু পরেই ট্রেন এসে পড়ল।

But the doors were all closed. Milly knew they would open. But Milly did feel a little anxious for a moment. "Shall we be able to get in before the train starts again?"

They did get in. The doors closed. The train started. In a few minutes they were in Esplanade.

"It *is* fast," said Mr. Roy when they had got out.

এবারে লক্ষ করো, জোর দিয়ে কিছু বলতে গেলে শুধু মাত্র একটি শব্দের ওপর একটু জোর দিয়ে বললেই হতে পারে:

It *is* clean.
They *can*, if they want to.

আবার, এভাবেও বলা যায়:

They *do* seem to take good care.
They *did* get in.

প্রসাদ

কুয়াশার মধ্যে কী দেখা গিয়েছিল ?

কুয়াশায় নোটন

সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

কুয়াশার মধ্য দিয়ে চলছিল নোটন। এত ঘন কুয়াশা ও এর আগে কখনও দেখেনি। সমস্ত মাঠটা ভরে গেছে কুয়াশায়। দু'হাত দূর পর্যন্ত শুধু দেখা যাচ্ছে। যেই এগিয়ে যাচ্ছে, সামনেটা একটু পরিষ্কার হচ্ছে, পেছনটা কুয়াশায় ঢেকে যাচ্ছে। আজ খুব ভোরে উঠেছে নোটন। এখনও পিসি ওঠেননি। পিসিকে নোটন খুব ভালবাসে, আবার খুব ভয়ও পায়। পিসি ওর জামাকাপড় ঠিক করে দেন। পড়াশোনা দেখিয়ে দেন। ভাল সিনেমা এলে নিয়ে যান। অন্যদিকে কোন্ কাজটা করা উচিত আর কোন্ কাজটা করা উচিত নয়, সে সম্বন্ধে খুবই সজাগ থাকেন পিসি। নোটন দেখেছে যে, যেসব কাজ করে আনন্দ পাওয়া যায়, পিসি সেগুলি অপছন্দ করেন। পিসির অভিধানে সবচেয়ে খারাপ শব্দ হল অসভ্যতা। আর কোন জিনিসটা অসভ্যতা, সেটা ঠিক করেন পিসি। সুতরাং পিসির অশেষ গুণ থাকা সত্ত্বেও পিসিকে বেশ খানিকটা ভয় করে নোটন। রাস্তায় ক্রিকেট খেলা দেখতে নোটন খুব ভালবাসে। ওর খেলতেও ইচ্ছে করে। কিন্তু নোটন কখনও ভুলেও কথাটা উচ্চারণ করে না। কারণ তাহলে পিসির চুলগুলি খাড়া-খাড়া হয়ে যাবে। চোয়ালটা শক্ত হবে। চোখ দুটো গোল্লা হবে। মোটের ওপর, ব্যাপারটা নোটনের পক্ষে সুখের হবে না। পাশের বাড়ির কদমগাছে ঝাঁকড়া বেঁধে ফুল ফোটে। গোল গোল কী সুন্দর ফুল। পাড়ার ছেলের দল গাছে উঠে সে-সব ফুল পাড়ে। নোটনের ইচ্ছা করলেও চেপে রাখে ইচ্ছা।

নোটনের দিদিও ঘুম থেকে ওঠেনি। দিদির কথা মনে হতেই নোটনের মনটা আনন্দে ভরে গেল। দিদি ওর ভারী আপন। দিদির কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল আর টিকলো নাক দেখলে ওর মনে হয়, আসলে দিদি বোধহয় কোনো রাজকন্যা, ভুল করে এখানে চলে এসেছে। নোটন দেখেছে, অনেক দিন ছাতের এক কোণে দাঁড়িয়ে ওর দিদি একদৃষ্টে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। নোটন জানে, দিদি কাকে খুঁজছে, কার কথা ভাবছে। কিন্তু সে-কথা ভাবতে ওর নিজেরও কান্না পায়।

দিদি যদি সত্যি অন্য কোনো দেশের রাজকন্যা হয়, আর ওকে ফেলে কোনো জাদু-গালিচায় বসে অন্য কোথাও চলে যায়, তাহলে নোটন কী করবে ? পিসি আছেন, ঠাকুরভাই আছেন, ঠাকুনমা আছেন। (দিদি ছোটবেলায় ঠাকুরমা বলতে পারত

আপনার শিশুর চাই যত্ন এবং
কেয়ো-কার্পিন ম্যাসাজ অয়েল
Keo Karpin Massage Oil
ভিটামিন ই, এ এবং ডি-সমৃদ্ধ কেয়ো-কার্পিন ম্যাসাজ অয়েল।
অতি কোমলভাবে আপনার শিশুর ত্বকের যত্ন ও পরিচর্যার জন্য সব কিছুই রয়েছে কেয়ো-কার্পিন ম্যাসাজ অয়েল এ। এর অলিভ অয়েল, ল্যানোলিন এবং চন্দন তেল মিশ্রিত বেসে রয়েছে ই, এ এবং ডি ভিটামিন। আপনার শিশুর ত্বকে রেশমের মত নরম মসৃণতা আনতে পারে এই তেলই।
পরিবারের সকলের জন্যই সমান উপকারী।
PX/KMO/B-1/84
দে'জ এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন
Dey's

না, তাই সবাই ঠাকুনমা বলে ।) এ ছাড়া বাবা আছেন । বাবা যখন কলকাতায় আসেন, তখন দিদি আর নোটন খুব খুশি হয় । বাবা চলে গেলে ওদের মনটা খারাপ লাগে । তবু নোটনের কাছে দিদি আলাদা । দিদি যে একদম মা'র মতো দেখতে ।

নোটন যে আজ ভোরবেলা বাড়ি থেকে একলা বেরিয়ে এসেছে, পিসি সেটা জানেন না । জানলে যদি 'না' বলতেন, তাহলে নোটনের বেরোনো হত না । আজ কয়েকদিন ভোরবেলা একটা ভারী সুন্দর হলদে পাখি এ-পাড়ায় ঘুরে বেড়ায় । পাখিটাকে দেখতে যেমন সুন্দর, ডাকটাও তেমনি মিষ্টি । নোটন ঠিক করেছে ওর ডাকটা টেপ-রেকর্ডারে ধরে রাখবে । এই টেপ-রেকর্ডারটা বাবা ওকে এনে দিয়েছেন । কী সুন্দর যে দেখতে, নোটনের খুব প্রিয় । কিন্তু আজ সকালে যে এমন কুয়াশা হবে, কে জানত । ও তো জানে এই মাঠটা পেরোলেই একটা বিরাট স্কুলবাড়ি আছে । অন্যদিকে রয়েছে বিশাল উঁচু-উঁচু বাড়ি । সব ছাপিয়ে উঠেছে টিভি টাওয়ার । কিন্তু এখন কি ভাবা যায় যে, এ-সব আছে ? এখন মনে হচ্ছে চারিদিকে কুয়াশা ছাড়া আর কিছু নেই । পাখিটা কিন্তু এই মাঠেরই কোনো গাছে এসে বসেছে । টেপ-রেকর্ডারটা খোলা রেখেছে নোটন । হঠাৎ পাখিটা ডেকে উঠল । নোটনের মন আনন্দে ভরে গেল । পেরেছে ও পাখিটার ডাককে রেকর্ডে বন্দী করতে । পাখিটা ডাকতেই একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল । আস্তে-আস্তে কুয়াশা ফিকে হতে শুরু করল । গাছপালা একটু একটু করে দেখা যেতে লাগল । একটু পরেই কুয়াশাটা পুরো কেটে গেল । কিন্তু চমকে উঠল নোটন ।

এ কোথায় এল নোটন ? নোটনের স্পষ্ট মনে আছে, খেলার মাঠে গিয়েছিল সে । বাড়ি থেকে কয়েক পা গেলেই যে মাঠ পড়ে, সেখানেই এসেছিল । আর এখন দেখতে পাচ্ছে, ও একটা রাস্তার ধারে এসে দাঁড়িয়েছে । রাস্তার দু'ধারে অনেক লোক । বাড়ির আনাচে-কানাচে সব লোক ভর্তি, সবাই দেখছে । একটা শোভাযাত্রা আসছে । দূর থেকে গান শোনা যাচ্ছে । মিছিলটা এগিয়ে এল । মিছিলের সামনে একজন খুব চেনা লোক । কাঁচাপাকা দাড়ি । তিনি গান গাইছেন । পাশে বেশ মোটামতো আরেকজন লোক । তিনিও গাইছেন । গাইছে সবাই । গানটা নোটনের চেনা । "বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান, তুমি কি এমনি শক্তিমান ।"

সেই কাঁচাপাকা দাড়িওয়ালা মানুষটিকে দেখেই মেয়েরা যারা বাড়ির আলসেতে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা হুলুধ্বনি দিল । আরও অনেকে শাঁখ বাজাতে লাগল । নোটন তার টেপ-রেকর্ডার খুলে সেই মিছিলের সঙ্গে চলতে লাগল । মিছিল এসে গঙ্গার ঘাটে পৌঁছল । গঙ্গার ঘাটও লোকে লোকারণ্য । সবাই স্নান করতে শুরু করল । সেই চেনা-চেনা ভদ্রলোকও স্নান করলেন । স্নান সারা হলে গান বদলে গেল । এবার শুরু হল অন্য এক গান । সেটাও নোটনের চেনা ।

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল—
পুণ্য হউক পুণ্য হউক পুণ্য হউক
হে ভগবান ।

নোটন অবাক হয়ে দেখল গাদা-গাদা রাখি নিয়ে সবাই সবাইকে পরাচ্ছে । একজন এসে নোটনের হাতেও একটা রাখি পরিয়ে গেল । গঙ্গার ঘাটটা একদম অন্যরকম লাগছিল । নোটন অবাক হয়ে দেখছিল এ এক অন্য শহর । তার খুব পরিচিত জগন্নাথঘাটটা কীরকম নতুন লাগছিল । মিছিল আবার এগিয়ে চলল । এবার এসে পৌঁছল একটা বিরাট বাড়ির কাছে । নোটন গল্পেই শুনেছে আস্তাবল সহিস আর ঘোড়ার কথা । এখানে দেখল কত ঘোড়া । সহিসরা তাদের দলাই-মলাই করছে, খাবার দিচ্ছে । সেই ভদ্রলোক হঠাৎ এগিয়ে গেলেন আর সহিসদের হাতে রাখি পরিয়ে তাদের সঙ্গে কোলাকুলি করলেন । নোটনের পাশের সুন্দরমতো ভদ্রলোক বললেন, "ও সুরেন, রবিকাকা একটা হাঙ্গামা বাধাবেন ।"

নোটন সঙ্গে-সঙ্গে বুঝতে পারল ও কীভাবে যেন রাখিবন্ধন উৎসবের মধ্যে এসে পড়েছে । আর সত্যি-সত্যি রবীন্দ্রনাথকে দেখতে পাচ্ছে । কী সুন্দর দেখতে । কিন্তু যে মুহূর্তে ও বুঝতে পারল ও কোথায় আছে, সেই মুহূর্তে ওর চারপাশের সমস্ত বদলে যেতে শুরু করল । ও খুব চট করে আবার নিজের চেনা মাঠটায় চলে এল । কুয়াশা অনেকটাই কেটে গেছে । মনে পড়ে গেল, পিসির ঘুম এতক্ষণে ভেঙে গেছে । ও বাড়ির দিকে পা চালাল ।

ওর টেপ-রেকর্ডে পাখির ডাকটা খুব সুন্দর এসেছে । তারপরই কিন্তু ঘস্‌ঘস্ শব্দ । সেই সুন্দর গানগুলি একটাও আসেনি । কিন্তু নোটন কী করে এ-সব কথা বলে । কেউ তো বিশ্বাস করবে না । তবে দিদিকে বলা যায় । কিন্তু দিদিকে তো একলা পাওয়া ভার । সুযোগ এল বিকেলবেলায় । ছাতের ওপর । দুই ভাইবোনে কথা হল । দিদি সব শুনে অবাক হয়ে গেল । "তুই রবীন্দ্রনাথকে দেখলি নোটন ?" দিদি প্রশ্ন করল । তারপর বলল, "ওইরকমই হয়েছিল যে রাখিবন্ধনের উৎসবে । বইয়ে এসব লেখা আছে । তুই যাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলি, তিনি অবনীন্দ্রনাথ । 'রাজকাহিনী' 'বুড়ো আংলা'র লেখক । খুব সুন্দর ছবি আঁকতেন ।"

একটু চুপ করে দিদি বলল, "এবার যখন কুয়াশা পড়বে, আমরা দুজনেই একসঙ্গে বেরোব রে । কুয়াশা সরে গেলে যদি অদ্ভুত কিছু ঘটে, তাহলে আমরা দুজনেই একজনের কাছে যাব বল তো কার কাছে ?"

নোটনের চোখে জল এসে গেল । দিদির কোলে মুখ গুঁজে বলল, "জানি ।"

দিদি নোটনের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল ।

ছবি : জয়ন্ত ঘোষ

শেষ জীবনে ফরাসি শিল্পী রেনোয়ার হাত প্রায় অসাড় হয়ে যায় । ক্ষতবিক্ষত আঙুলে তুলি চেপে তাঁকে ছবি আঁকতে দেখে বন্ধু মাতিস বললেন, এত যন্ত্রণা সহ্য করেও তুমি ছবি আঁকছ ? রেনোয়া আশ্চর্য শান্ত স্বরে উত্তর দিলেন, যন্ত্রণা তো মৃত্যুর সঙ্গেই শেষ, সৌন্দর্য চিরদিন থাকবে ।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সদাশিব হৈ হৈ কাণ্ড চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার ছবি : বিমল দাস

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ছবি এঁকেছে **দেবযানী বসু** (বয়স ১২)

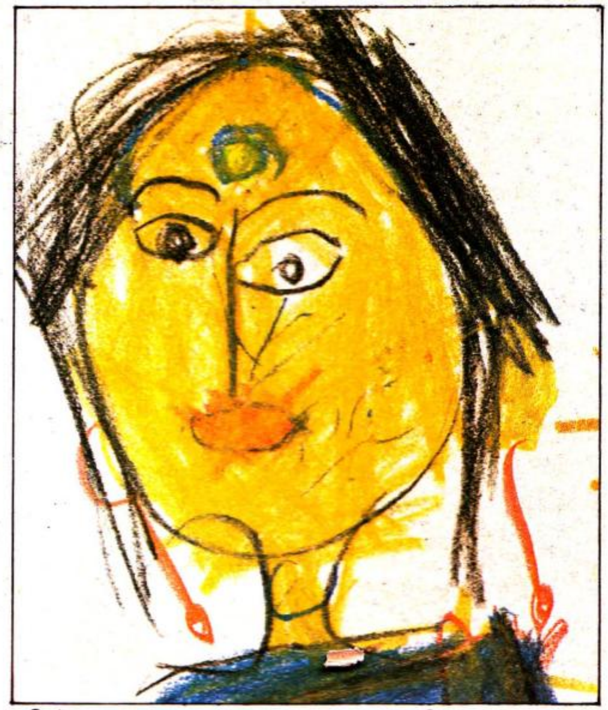

ছবি এঁকেছে **তৃণা বন্দ্যোপাধ্যায়** (বয়স সাড়ে তিন)

ছবি এঁকেছে **সুদীপ্তা সেনগুপ্ত** (বয়স ১৩)

পা বাড়িয়েই বিদেশ

ঘর থেকে দু-পা বাড়িয়েই বিদেশ। না না, বাংলাদেশের কথা বলছি না। কারণ রাস্তার অবস্থা যাই হোক, বাংলাদেশ তথা ওপার বাংলাকে এখনও এপার বাংলার অনেক মানুষ মনেপ্রাণে বিদেশ বলে ভাবতে পারেন না। বলছি আমাদের উত্তর সীমান্তের পাহাড়ি দেশ, বন্ধুরাষ্ট্র ভুটানের কথা। আজকের বিশ্বে রাজতন্ত্র প্রায় লুপ্ত। যে গুটিকয় দেশে রাজারা এখনও দাপটের সঙ্গে টিকে আছেন ভুটান তাদের অন্যতম। রাজাই এখানে সর্বোচ্চ শাসক, আনুষ্ঠানিক প্রধান মাত্র নন।

সম্প্রতি দেখে এলাম জলপাইগুড়ি জেলা ও আসামের গোয়ালপাড়া, কামরূপ, মঙ্গলদই জেলার উত্তর সীমান্তে ১৬,০০০ বর্গমাইল এলাকা-জোড়া এই রাজ্য। লোকসংখ্যা নয় লক্ষের মতো। তোর্সা, কালজানি, রায়ডাক, সঙ্কোশ, গদাধর, চম্পামতী, মানস, ধানশ্রী ইত্যাদি ব্রহ্মপুত্রের বহু উপনদী ভুটানের পাহাড় বা তারও উত্তরে তিব্বতের মালভূমিতে উৎপন্ন হয়ে উত্তরবঙ্গ ও আসামের ডুয়ার্স এলাকার ওপর দিয়ে প্রবাহিত। পাহাড়ের পর পাহাড়ে সাজানো অপরূপা দেশ। কমলালেবু, আপেল, আঙুর, আদা, ভুট্টা ও কাঠ এখানে পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণে।

ভুটানের প্রবেশপথ এবং প্রধান বাণিজ্য-শহর ফুন্টশলিঙ আমাদের ঘরের কোনায়—উত্তর বাংলার পূর্বোত্তর প্রান্তে। রাজধানী থিম্পু অবশ্য ভুটানের অভ্যন্তরে উত্তর-পশ্চিম দিকে। ফুন্টশলিঙ থেকে থিম্পু পর্যন্ত দীর্ঘ সর্পিল পাহাড়ি পথে নিয়মিত চলে ভুটানের সরকারি বাস।

পাহাড়ের পাদদেশে ফুন্টশলিঙ শহরে ছড়িয়ে আছে ভুটান ব্যাঙ্ক, আধুনিক হোটেল, দোকানপাট ইত্যাদি। পাহাড়চূড়ায় বুদ্ধমন্দির 'গুম্ফা' এবং হাসপাতাল, আরও ওপরে চুখা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। নীচে, দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত তোর্সা। ডাকটিকিট ও মুদ্রা-সংগ্রহ যাদের শখ, ভুটানের রঙবেরঙের ডাকটিকিট ও বিভিন্ন ধরনের মুদ্রা তাদের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। ভারতীয় টাকা-পয়সাও ওখানে চালু।

দার্জিলিং বা জলদাপাড়া অভয়ারণ্যে যাঁরা বেড়াতে আসেন, তাঁরা অনায়াসে আলিপুরদুয়ার, হাসিমারা বা শিলিগুড়ি থেকে বাস, মিনিবাস বা ট্যাক্সিতে চেপে ডুয়ার্সের চা-বাগানের গা ছুঁয়ে ফরেনল্যাণ্ড ভুটান ঘুরে আসতে পারেন। পাসপোর্ট বা ভিসার দরকার নেই।

শুভজ্যোতি ঘোষ (বয়স ১১)

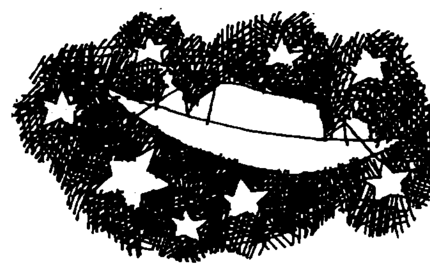

অনেক রাতে

অনেক রাতে যায় যে ভেসে
নৌকোগুলোর সারি,
ভাঁটার টানে আকাশ পানে
অনেক দূরের তারায়—
কেউ জানে না বাইছে কারা
কোথায় তাদের বাড়ি,
দিনের আলো যখন ফোটে
তখন তারা হারায়।
কিন্তু থাকে মনের মাঝে
রাতের বেলা পাড়ি,
ভাবনা হয়ে যায় যে ভেসে
নৌকোগুলোর সারি ॥

ঋতুপর্ণা গোস্বামী (বয়স ৮)

আকাশের পুকুর

মাগো, আমায় সত্যি করে বল্
আকাশেতে কোথা থেকে আসে এত জল ?
সারাদিনই বৃষ্টি পড়ে
সকাল-সন্ধ্যা-দুপুর—
আকাশেতে আছে কি মা
মস্ত এক পুকুর ?
মা বলেন, সব ভগবানের দান
আমরা সবাই তাঁরই তো সন্তান।
এখন বুঝি জল যত সব
বাষ্প হয়ে উড়ে,
গরমেতে হালকা হয়ে
আকাশেতে চড়ে।
ওখানেই তা ঠাণ্ডা হয়—
পরে আবার পড়ে
বৃষ্টির রূপ ধরে।

শুভায়ু সাহা (বয়স ১০)

ছুটিতে

রাখাল বিশ্বাস

ছুটিতে ছুটব বলে
খুশিতে বাজাই বাঁশি
যদি চাস্ সঙ্গে নেব
পুরীতে গয়ায় কাশী।

পাহাড়ে রঙিন চুড়ো
আহা রে জমবে খেলা
মেঘের ওই দুপুরটাকে
বানাব রথের মেলা।

শিলঙে দার্জিলিঙে
ছোটাব শীতের ঘোড়া
গরমে কুলপি মালাই
খাব সে পাতায় মোড়া।

যাযাবর ছুটির পাখি
ডাকে ওই মিষ্টি সুরে
হাওড়ার ব্রিজ পেরিয়ে
যাব তাই যাবই দূরে।

ছবি : দেবাশিস দেব

ভৌত খবর

মৃণালকান্তি দাশ

ভূতেরা কি রোগা হয়
নাকি খুব মোটা —
সক্কালবেলা খায়
আলুর পরোটা !
তারা কি বেড়াতে যায়
বন্ধুর বাড়ি —
পায়দলে যায়, নাকি
চড়ে হাওয়াগাড়ি !
ল· সা· গু·, গ· সা· গু· কষে
কটা তার ভুল —
কোন্ গাছ ভালবাসে
নিম না তেঁতুল !
গপ্পো শোনে কি বসে
ঠাম্মার কোলে —
দুধভাত খেয়ে শোয়
রাত্তির হলে !
জানতে চাইলে সব
ভৌত খবর —
বই পড়ো, লিখেছেন
ভূতনাথ ধর !

ডাক্তারি

পুণ্ডরীক চক্রবর্তী

তেষ্টায় ছাতি ফাটে
শুনে বলে, "তারা,
কাঠফাটা রোদ্দুরে
এক পায়ে দাঁড়া।"
ঠ্যাং ভেঙে কেউ এলে
বলে, "এক ক্রোশ
ছুটে এসে করো দেখি
দুশো ওঠ-বোস।"
জ্বর হলে খেতে বলে
দু'বেলাই ভাত,
ঘুম নেই শুনে বলে,
"জেগে থাকো রাত।"
পেটের ব্যারাম হলে
খেতে বলে লুচি,
সর্দিতে বুকে দেয়
বরফের কুচি।
হারাধন ডাক্তারে
এ কী ভূতে পেল
রুগি মরে গেছে শুনে
বলে, "বাঁচা গেল।"

ওষ্ঠবক্র রহস্য

সার আর্থার কোনান ডয়েল

সেন্ট জর্জেস-এর থিওলজিকাল কলেজের পরলোকগত অধ্যক্ষ ডক্টর অব ডিভিনিটি এলিয়াস হুইটনির ভাই ইসা হুইটনির আফিম খাওয়ার অভ্যেস ছিল। আফিম খেলে আশ্চর্য অনুভূতি হয়, ছাত্রজীবনে এই কথা পড়ে তিনি শখ করে আফিম ধরেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই বুঝলেন যে, এই অভ্যেস ধরা সোজা, কিন্তু ছাড়া ভীষণ শক্ত। আমার সঙ্গে যখন তাঁর পরিচয় হয়, তখন তাঁর শরীর একদম ভেঙে গেছে। তোবড়ানো গাল, ঘোলাটে দৃষ্টি। দু' চোখের পাতা যেন সব সময়েই বন্ধ হয়ে আসছে। চেয়ারে বসে থাকা এই ভগ্নস্বাস্থ্য লোকটিকে দেখলে আমার কষ্ট হয়।

১৮৬৯ সালের জুন মাসের এক রাত্তিরে আমার সদর দরজার ঘণ্টা বেজে উঠল। বেশ রাত হয়েছে। বসে-বসে হাই উঠছিল, ভাবছিলুম এবার শুতে যাব। ঘণ্টা শুনে আমি চেয়ারে সিধে হয়ে বসলুম। আমার স্ত্রী সেলাই করছিলেন। সেলাইটা রেখে হাল-ছেড়ে-দেওয়া ভাবে আমার দিকে তাকালেন।

"এ নিশ্চয়ই কোনো রুগি। তোমাকে নির্ঘাত এইরাত্রে বেরুতে হবে।"

আড়মোড়া ভেঙে আমি বললুম, "আর পারা যায় না। সমস্ত দিন প্রচুর খাটাখাটনি করে আমি একটু আগে ফিরেছি।"

আমরা দরজা খোলার আওয়াজ শুনলুম। দু-চারটে কথাও অস্পষ্ট ভাবে শোনা গেল। তারপরেই আমাদের ঘরের দরজা খুলে গেল। ঘরে ঢুকলেন কালো ওড়নায় মুখ ঢাকা কালো জামাকাপড় পরা এক ভদ্রমহিলা।

"এত রাতে এসে তোমাদের জ্বালাতন করছি বলে ক্ষমা কোরো।" এইটুকু বলেই ভদ্রমহিলা নিজেকে আর সামলাতে না পেরে ছুটে এসে আমার স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন। "আমার বড় বিপদ। আমাকে সাহায্য করতেই হবে," কাঁদতে কাঁদতে তিনি বললেন।

"কী কাণ্ড!" ভদ্রমহিলার মুখের ওড়নাটা সরিয়ে দিয়ে আমার স্ত্রী বললেন, "আরে কেট হুইটনি যে! তুমি তো আমাকে দারুণ ঘাবড়ে দিয়েছিলে। তুমি যখন ঘরে ঢুকলে আমি তোমায় চিনতেই পারিনি।"

"কী করব বুঝতে না পেরে আমি সোজা তোমার কাছে চলে এলুম।"

বরাবর দেখছি যে, যখনই কোনো ভদ্রমহিলা কোনো গোলমালে পড়েন তখনই তিনি আমার স্ত্রীর কাছে ছুটে আসেন, আলোর কাছে পতঙ্গ যেমন ছুটে আসে।

আমার স্ত্রী বললেন, "খুব ভাল করেছ। আগে এক গেলাস জল না চা না কফি কী খাবে বলো। তারপরে ধীরেসুস্থে সব কথা বলবে।" তারপর আমাকে দেখিয়ে বললেন, "ওঁকে কি এখান থেকে যেতে বলব?"

"না, না, ডাক্তারবাবুকেই আমার দরকার। ব্যাপারটা আমার স্বামী ইসাকে নিয়ে। গত দুদিন ধরে সে ঘরে ফেরেনি। তার জন্যে আমার বড্ড দুশ্চিন্তা হচ্ছে।"

এর আগেও কেট হুইটনি তার স্বামী ইসা হুইটনির কথা আমাদের কাছে দু-চারবার বলেছে। আমাকে বলেছে আমি ডাক্তার বলে আর আমার স্ত্রীকে বলেছে তার ছেলেবেলার বন্ধু হিসেবে। তার কথা শুনে আমরা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করলুম। ইসা কোথায় গেছে তা কি কেট জানে? আমরা কি চেষ্টা করলে তাকে ফিরিয়ে আনতে পারি?

কেটের কথা শুনে মনে হল যে, ইসাকে ফিরিয়ে আনবার জন্যেই এত রাত্রে সে আমাদের কাছে ছুটে এসেছে। কেট জানতে পেরেছে যে, বেশ কিছুদিন হল ইসা লণ্ডনের পূর্বাঞ্চলে একটি আফিমখোরদের আড্ডার সন্ধান পায়। প্রথম-প্রথম সে ওই আড্ডায় যেত কিছুক্ষণের জন্যে। সন্ধের মধ্যেই ফিরে আসত। এবারে আটচল্লিশ ঘণ্টা হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত তার পাত্তা নেই। কেটের দৃঢ় বিশ্বাস যে, আপার সোয়ানডাম লেনের 'দি বার অব গোল্ড'-এ গেলে ইসাকে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। কিন্তু সে কী করতে পারে? কী করে সে একলা ঐ দুর্দান্ত পাড়ায় গিয়ে তার স্বামীকে ফিরিয়ে আনবে?

এই অবস্থায় কী করা উচিত? আমার পক্ষে কি কেটের সঙ্গে দি বার অব গোল্ডে যাওয়া সম্ভব? কেটেরই বা যাবার দরকার কী? আমি তো ইসার ডাক্তার। আমি একলা গিয়েই তো তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিয়ে আসতে পারি। এইসব কথাবার্তার পর ঠিক হল যে, আমি এখনই ইসার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ছি। আর যদি ওই ঠিকানায় সে সত্যিই থাকে তবে তাকে আমি ঘণ্টা-দুয়েকের মধ্যে বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ঠিক দশ মিনিটের মধ্যেই আমি একটা ঘোড়ার গাড়িতে চেপে আপার সোয়ানডাম লেনের দিকে চললুম। প্রথমে বেশ নির্বিঘ্নেই গেলুম। কিন্তু মুশকিল হল পরে। আপার সোয়ানডাম লেন একটা কুখ্যাত গলি। রাস্তাটা টানা চলে গেছে লণ্ডন ব্রিজের পুবদিকে নদীর উত্তর তীর ধরে মাল তোলা-নামানোর ঘাটগুলোর সমান্তরাল। একটা শস্তার তৈরি জামাকাপড়ের দোকান আর শস্তার চায়ের কেবিনের মাঝখান দিয়ে একটা সিঁড়ি কয়েক ধাপ নেমে গেছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন একটা অন্ধকার গুহার মুখ। অনেক খোঁজাখুঁজির পর আমি বুঝতে পারলুম যে, ওইটেই আফিমখোরদের আড্ডা। আমার ভাড়াগাড়ির কোচোয়ানকে সেইখানে অপেক্ষা করতে বলে আমি সাবধানে সেই প্রায়-অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলুম। ওপর থেকে একটা লণ্ঠনের আলো এসে পড়ছিল। সেই আলোয় কোনোরকমে ঠাহর করে আমি তো দি বার অব গোল্ডের দরজাটা খুঁজে পেলুম। ঢুকে দেখলুম যে, ঘরের ভেতরের

বাতাসটা যেমন ভারী তেমনি কটু গন্ধ আর ধোঁয়ায় ভরা।

সেই ধোঁয়ায় ভর্তি আলো-আঁধারি ঘরে ঢুকতেই দেখলুম যে, বহুলোক সেই ঘরের মধ্যে হাত-পা এলিয়ে শুয়ে-বসে বা আধশোয়া অবস্থায় রয়েছে। এদের মধ্যে কেউ-কেউ আবার মরা ছাগলের মতো চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। এদের মধ্যে বেশিরভাগ লোকই চুপচাপ বসে ছিল, খুব অল্প কয়েকজন নিচু গলায় নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিল।

আমি ঘরে পা দিতে না দিতেই একজন মালয় দেশীয় লোক এসে আমাকে 'আসুন, আসুন' বলে অভ্যর্থনা করল। আমি তাকে বললুম যে, আমি খদ্দের হয়ে এখানে আসিনি। ইসা হুইটনি বলে আমার এক বন্ধু এখানে এসেছে, তার সঙ্গে কথা বলতে আমি এসেছি।

আমার ডান দিকে কে যেন নড়ে উঠল, আর তারপরেই একটা চিৎকার। আধো-অন্ধকারের মধ্যে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলুম যে, ইসা হুইটনি আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। তার চোখে কেমন যেন একটা ফ্যালফ্যালে দৃষ্টি ; তার পোশাক অত্যন্ত ময়লা আর সমস্ত শরীরে যেন কালির ছোপ পড়ে গেছে।

"হা অদৃষ্ট ! ওয়াটসন যে ! কী ব্যাপার," তাকে দেখে আমার করুণা হল। তার শরীরে যেন ক্ষমতা নেই। হাত-পা দুর্বল। "ওয়াটসন, কটা বাজে বলুন তো ?"

"প্রায় এগারোটা।"

"তার মানে ?"

"আজ জুন মাসের ১৯ তারিখ। শুক্রবার। সময় রাত্রি এগারোটা।"

"সে কী ! আমি তো ভেবেছি আজ বুধবার। আজ তো বুধবারই। শুধু-শুধু আপনি আমাকে নিয়ে রসিকতা করছেন কেন ?" এই বলে সে বেঞ্চে এলিয়ে বসে পড়ল।

"শুনুন। আজ শুক্রবার। গত দুদিন যাবৎ আপনার কোনো খবর না পেয়ে আপনার স্ত্রী ভাবনায়-চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়েছেন। আপনার নিজের স্বভাবের জন্যে অনুতপ্ত হওয়া উচিত।" আমি কিছুটা কঠিন ভাবে বললুম।

"বিশ্বাস করুন, আমি সত্যি-সত্যিই অনুতপ্ত। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, ডঃ ওয়াটসন, আপনি বোধহয় একটু ভুল করছেন। আমি তো অল্প কিছুক্ষণ আগে এখানে এসেছি। যাই হোক, আমি এক্ষুনি বাড়ি যাব। সত্যি কেটের ওপর খুব অন্যায় করে ফেলেছি। ... আমাকে একটু উঠতে সাহায্য করবেন কি ? আপনার সঙ্গে কি গাড়ি আছে ?"

"হ্যাঁ, আমার গাড়ি বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।"

"তা হলে আপনার যদি আপত্তি না থাকে তো আমি ওই গাড়িটা নিয়েই বাড়ি চলে যাই। আর একটা কথা, আপনি যদি একবার ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে বলেন যে, আমার শরীরটা খুব দুর্বল বোধ হচ্ছে বলে আমি ম্যানেজারের কাছে গেলুম না, তা হলে বড় ভাল হয়।"

ইসা হুইটনিকে অপেক্ষা করতে বলে আমি সেই অন্ধকার ধোঁয়ায় ভর্তি ঘরের মধ্যে দিয়ে ম্যানেজারের খোঁজে চললুম। যখন আমি একটা বেঞ্চিতে বসা একটা লম্বা লোকের সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলুম, তখন কে যেন পিছন থেকে আমার কোট ধরে টেনে চাপা গলায় বললে, "আমার সামনে দিয়ে চলে যাবার পর পেছনদিকে তাকিও।" আমার শুনতে

বিন্দুমাত্র ভুল হয়নি। আমি পাশে তাকালুম। আমার পাশেই একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি চুপচাপ বসে ছিলেন। তাঁর কোনো বাহ্যজ্ঞান আছে বলে আমার মনে হল না। আমি দু' পা এগিয়ে গিয়ে পিছন ফিরে তাকালুম। সেই মুহূর্তে জানি না কী অসীম চেষ্টায় আমি চিৎকার করে ওঠা থেকে নিজেকে সংযত করলুম। সেই বৃদ্ধ লোকটি আমার দিকে তাঁর মাথাটা এমন ভাবে সামান্য ঘুরিয়েছেন যাতে তাঁর মুখটা একমাত্র আমিই দেখতে পাই। তাঁর চোখমুখের বার্ধক্যের ছাপটা সরে গেল। আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি-মুচকি হাসছে শার্লক হোম্‌স। হোম্‌স আমাকে ইঙ্গিতে তার দিকে এগিয়ে আসতে বললে। আর সঙ্গে সঙ্গে তার চোখমুখে সেই বৃদ্ধের ভাবটা ফিরে এল।

আমি ফিসফিস করে বললুম, "হোম্‌স, তুমি এখানে কী করছ ?"

"চুপ। আরও আস্তে কথা বলো। আমার কান খুব পরিষ্কার। তুমি যদি তোমার ওই জবুথবু বন্ধুটিকে বিদায়

করতে পারো তো ভাল হয়। তোমাকে আমার বিশেষ দরকার।"

"আমি বাইরে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি।"

"তা হলে ওঁকে ওই গাড়িতে করে এখনই বাড়ি পাঠিয়ে দাও। আর কোচোয়ানের হাতে তোমার স্ত্রীকে চিঠি লিখে জানিয়ে দাও যে, আজ রাত্রে তুমি আমার বাসায় থাকবে। তুমি বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করো। আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে যাচ্ছি।"

শার্লক হোম্‌সের কথায় সব সময়েই এমন একটা সিরিয়াস ভাব থাকে যে, সে কিছু বললে তার কথার প্রতিবাদ করা যায় না। আর তা ছাড়া আমার মনে হল যে, হুইটনিকে এখান থেকে বের করে বাড়ির দিকে পাঠালেই আমার দায়িত্ব শেষ। সবচাইতে বড় কথা, শার্লক হোম্‌সের তদন্তের সঙ্গী হবার সুযোগ কোনো অবস্থাতেই আমি হাতছাড়া করতে চাই না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি হুইটনিকে ঘোড়ার গাড়িতে চাপিয়ে কোচোয়ানকে তার বাড়িতে নামিয়ে এই চিঠিটা আমার স্ত্রীকে দিয়ে দিতে বললুম। অল্প কিছুক্ষণ পরে অত্যন্ত অশক্ত এক বৃদ্ধ দি বার অব গোল্ড থেকে বেরিয়ে এল। আমি সেই বৃদ্ধের ছদ্মবেশধারী শার্লক হোম্‌সের পাশে-পাশে হাঁটতে লাগলুম। প্রায় আধ মাইলটাক রাস্তা হোম্‌স সেই বৃদ্ধের মতো কোনোরকমে টলতে টলতে পথ হাঁটতে লাগল আর ঘন-ঘন পিছন ফিরে দেখতে লাগল। তারপর হঠাৎ একসময় সে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে হো-হো করে হেসে উঠল।

"ওয়াটসন, তুমি নিশ্চয়ই ভাবছিলে যে আফিম ধরেছি।"

"সত্যি কথা বলতে কী, তোমাকে ওইভাবে ওখানে দেখে আমি খুবই আশ্চর্য হয়েছি।"

"তা যদি বলো তো তোমাকে ওখানে দেখে আমিও কম আশ্চর্য হইনি।"

"আমি গিয়েছিলুম আমার এক পরিচিত ভদ্রলোকের খোঁজে।"

"আর আমি গিয়েছিলুম আমার এক শত্রুর খোঁজে।"

"শত্রুর খোঁজে?" আমি বেশ অবাক হয়ে বললুম।

"হ্যাঁ। আমার জাতশত্রু, বলতে পারো স্বাভাবিক শিকার। সংক্ষেপে তোমায় বলি। এখন আমি বেশ একটা জটিল তদন্তে জড়িয়ে পড়েছি। আমি আশা করেছিলুম যে, এই আড্ডাখানায় নিয়মিত যে-সব লোক আসে, তাদের কথাবার্তা থেকে এ-ব্যাপারের কোনো একটা সূত্র হয়তো বা পেয়ে যাব। ওখানে যদি আমার আসল পরিচয় জানাজানি হয়ে যেত তাহলে আমাকে আর জীবন্ত অবস্থায় কখনও খুঁজে পাওয়া যেত না। এর আগে দু-একবার এই আড্ডায় এসে আমি কাজ হাসিল করে গেছি। এই আড্ডাখানার মালিক গুণ্ডাসর্দার ম্যানেজার বলেছে, আমাকে পেলে একবার দেখে নেবে। এই বাড়িটার একটা খিড়কি-দরজা আছে পলঘাটের কাছে। সেখান দিয়ে রাত্রের অন্ধকারে কত কী যে নদীতে চালান গেছে তা অনুমান করা শক্ত নয়।"

"কী বলছ? নিশ্চয়ই গোটা-গোটা মৃতদেহ চালান হয়নি।"

"হ্যাঁ, ওয়াটসন, মৃতদেহই পাচার হয়েছে। যত মৃতদেহ পাচার হয়েছে তার প্রত্যেকটির জন্যে যদি হাজার পাউণ্ড করে পেতুম, তা হলে এতদিনে আমরা বহু কোটিপতি হতে পারতুম। এ-রকম জঘন্য মৃত্যুকূপ টেমসের ধারে আর দ্বিতীয়টি আছে বলে আমার জানা নেই। আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, নেভিল সেন্ট ক্লেয়ার সেই যে জীবন্ত অবস্থায় এখানে ঢুকেছে, সে আর জীবন্ত অবস্থায় এখান থেকে বেরোয়নি। কিন্তু আমাদের গাড়িটার তো এখানেই থাকবার কথা।"

আমি কিছু বলবার আগেই হোম্‌স মুখের মধ্যে দুটো আঙুল পুরে দিয়ে খুব জোরে শিস দিলে। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই লোকজনের কথাবার্তা আর গাড়িঘোড়ার শব্দকে ছাপিয়ে আর একটা শিস শোনা গেল। আর তারপরেই ঘোড়ার খুরের খপ্‌খপ্‌ আর গাড়ির চাকার ঘর্ঘর শব্দ শোনা গেল। অন্ধকারের মধ্যে জোরালো দুটো আলো জ্বালিয়ে বেশ বড় একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল।

"কী ওয়াটসন, এখন আমার সঙ্গে যাবে তো?"

"আমি যদি তোমার কোনো কাজে লাগি তো অবশ্যই যাব।"

"বিশ্বস্ত সহকারীর প্রয়োজন সর্বদাই। তাছাড়া সে আবার যদি জীবনীলেখক হয় তো তাকে বাদ দেবার প্রশ্নই ওঠে না। আমার এখনকার আস্তানা সেডার্সে। একটা ডবল-বেড রুম।"

"সেডার্স?"

"হ্যাঁ। ওটা মিঃ সেন্ট ক্লেয়ারের বাড়ি। এই তদন্ত শুরু করার পর থেকে আমি ওখানেই আছি।"

"কিন্তু বাড়িটা কোথায়?"

"কেন্ট লিয়ের কাছে। আমাদের এখান থেকে পাক্কা সাত মাইল যেতে হবে।"

"আমি কিন্তু এখনও যে তিমিরে সেই তিমিরেই।"

"তাই তো বটে। ব্যস্ত হয়ো না, যেতে যেতে আমি তোমাকে সব কথা বলব। আগে উঠে পড়ো তো। জন, এই হাফ ক্রাউনটা রাখো। আজ রাত্তিরে তোমাকে আর আমার দরকার নেই। কাল সকাল এগারোটার সময় আমার সঙ্গে দেখা কোরো। ঠিক আছে।"

হোম্‌স পাকা কোচোয়ানের মতো চাবুক মারতেই ঘোড়াটা ছুটতে লাগল। প্রায় অন্ধকার জনহীন সব গলি দিয়ে আমাদের গাড়ি ছুটল। তারপর আমরা একটা অপেক্ষাকৃত বড় রাস্তায় এসে পড়লুম। তারপর একটা ব্রিজ পার হলুম। চকিতের জন্যে ব্রিজের নীচের কালো জল আমার চোখে পড়ল। আমরা বেশ কয়েক মাইল চলে এসেছি। আকাশে মেঘ রয়েছে। তার মাঝখানে কখনও-কখনও একটা-দুটো তারা একবার দেখা দিয়েই ফের মিলিয়ে যাচ্ছে। শার্লক হোম্‌স রাস্তার দিকে মাথা নিচু করে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। বুঝলুম যে, সে গভীর চিন্তায় ডুবে আছে। এখন কথা বললে যেভাবে তার চিন্তাকে সাজাচ্ছে তাতে বাধা পড়বে। এতটা পথ যে এলুম কিন্তু বিটের কনস্টেবল ছাড়া আর অন্য কোনো পথচারীকে দেখতে পেলুম না। আমাদের দু'পাশে কখনো বিরাট প্রান্তর আর মাঠ। এইভাবে বেশ কিছু রাস্তা পেরিয়ে যাবার পর আবার একটা দুটো করে ঘরবাড়ি চোখে পড়তে লাগল। আমার মনে হল যে, আমরা একটা লোকালয়ের কাছাকাছি চলে এসেছি।

অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

সতেরো ঘোড়সওয়ার হঠাৎ একসঙ্গে হেসে উঠল !

সতেরো ঘোড়সওয়ারের ভূত

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

গল্পটা শুনেছিলাম শিবুখুড়োর মুখে।

শিবুখুড়ো আমার বাবার দূরসম্পর্কের খুড়োমশাই, কিন্তু আমার চেনা-জানা সব মহলেই ওঁকে ওই এক সম্বোধনে ডাকতে শুনেছি।

শিবুখুড়োর বয়সের নাকি গাছ-পাথর নেই। ঠিক কত যে ওঁর বয়স কেউ তা জানে না। উনি নিজেও বোধহয় না। রোগাটে চেহারা। নাকের নীচে একজোড়া পুরুষ্টু গোঁফ, মাথার সামনেটা চকচকে টাক। চোখের দৃষ্টিতে সব সময়ই ঝকঝকে কৌতুক। শিবুখুড়ো বৃদ্ধ হলেও চিরনবীন।

উনি যখন মাঝেমধ্যে আমাদের বাড়ি আসেন, ছোটদের মধ্যে হৈ-চৈ শুরু হয়ে যায়। শিবুখুড়োকে সবাই বলে গল্পের জাহাজ। সারাজীবনে উনি কী না করেছেন ! হাতি কেনা-বেচা থেকে শুরু করে স্কুলমাস্টারি, কিছুই বাদ দেননি। সে-সব গল্প বলতে শুরু করলে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের তোয়াক্কা না রেখে আমরা গোগ্রাসে গিলি।

সেদিন শিবুখুড়ো আসার পরে হঠাৎ ঝেঁপে বৃষ্টি নামল। সে-বৃষ্টি আর থামতে চায় না। সুতরাং উনিও আটকে পড়লেন। তাল বুঝে আমরা ধরলাম, "খুড়ো, আজ গল্প বলতে হবে।"

পাঁচু বলল, "ভূতের গল্প। এই বর্ষায় জমবে।"

শিবুখুড়ো নাক চুলকে বললেন, "ভূত মানে কী জানিস ?"

মণিকা পণ্ডিতি করে বলল, "সবাই জানে। ভূতের দুটো মানে। একটা অর্থ মরে গিয়ে যা হয়, অন্যটা হল অতীত, কথায় বলে ভূত-ভবিষ্যৎ।"

"ঠিক," শিবুখুড়ো মাথা নাড়লেন, "যা ভূত তাই অতীত, আর তাই ইতিহাস। আজ বরং তোদের একটা ইতিহাসের গল্পই শোনাই।"

সঙ্গে-সঙ্গে আমরা সমস্বরে প্রতিবাদ করে বলে উঠি, "ওসব শুকনো ইতিহাস চলবে না খুড়ো, আমরা আসল ভূত চাই।"

শিবুখুড়ো মুচকি হেসে বললেন, "বেশ, তোদের কথা থাকবে, আমার কথাও থাক। গল্প আমি শুরু করছি, কিন্তু মাঝপথে বাধা পড়লেই থেমে যাব। রাজি ?"

সবাই রাজি।

শিবুখুড়ো শুরু করলেন, "তখন কিছুদিনের জন্যে কাজ পেয়েছি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে। যেখানেই পুরনো আমলের ধ্বংসাবশেষ বা ঢিবি-টিবি পাওয়া যাচ্ছে সেখানেই আমাদের প্রত্নতাত্ত্বিক দল গিয়ে খোঁড়াখুঁড়ি করে অতীত ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা করছে। সেবার যেতে হয়েছিল নদীয়ায়। তোরা হয়তো জানিস, নদীয়ার প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাসের বেশ কিছু গুরুত্ব আছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে এখানেই ছিল রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী। জনশ্রুতি আছে বক্তিয়ার খিলজি মাত্র সতেরোজন অশ্বারোহী সৈনিকের সাহায্যে আচমকা এসে নদীয়া জয় করে ফেলেছিলেন।"

"তবে যে শুনেছি সতেরো ঘোড়সওয়ারের নদীয়া-জয়ের বৃত্তান্ত আজকাল ঐতিহাসিকেরা আর বিশ্বাস করেন না।"

আমার কথা শেষ হল না, শিবুখুড়ো তর্জনী তুলে বললেন, "ফার্স্ট ওয়ার্নিং !"

সঙ্গে-সঙ্গে আমি চুপ। শিবুখুড়ো আবার শুরু করলেন,

"আমরা সেবার গিয়েছিলাম নদীয়ার কিছু প্রাচীন ঢিবি আর ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করে সেন-বংশের নতুন কোনো ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টায়। অনেকটা জায়গা জুড়ে খোঁড়াখুঁড়ি চলছিল। আমরা বাস করছি তাঁবু খাটিয়ে। কিছু-কিছু পাথুরে বা পোড়ামাটির মূর্তি, মুদ্রা ইত্যাদি পাওয়াও যাচ্ছে। মোটের ওপর আমরা বেশ উৎসাহিত। এমনই একদিন জলঙ্গি নদীর মাইলখানেক দূরে এক জায়গায় খোঁড়াখুঁড়ি করতে মাটির নীচ থেকে উঠে এল একটা পিতলের কমণ্ডলু আর সামনাসামনি মুখ-জোড়া দুটি মাটির সরা। নিশ্চয়ই কোনো সাধু-সন্ন্যাসীর আখড়া বা মন্দির-টন্দির ছিল জায়গাটায়। জিনিসদুটোর মধ্যে বৈশিষ্ট্য বিশেষ কিছু নেই, তবু পুরনো নিদর্শন তো বটে। নিয়ে এলাম তাঁবুর মধ্যে। তারপর সারাদিন ঘোরাঘুরি, কাজকর্ম সেরে রাত্রে তাঁবুতে শুতে এলাম। আমার তাঁবুটায় আমি একাই ছিলাম। একটা ছোট ক্যাম্পখাট আর কুঁজো-টুজো ছাড়া তাঁবুর মধ্যে অন্য কিছু ছিল না। কমণ্ডলু আর মুখ-জোড়া সরাদুটো রেখেছিলাম একটা প্যাকিংবক্সের ওপর।

"রাত্রে খাওয়া-দাওয়া, শেষ-দফা আলোচনা পর্ব সেরে তাঁবুর ভেতর ঢুকে যথারীতি হ্যারিকেনের শিখা কমিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। রেডিয়াম দেওয়া হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত দুটো। বাইরে নিথর রাত। কিন্তু এ-সময় ঘুমটা ভাঙল কেন। হঠাৎ মনে হল কোথা থেকে একটা ঘড়ঘড় সাঁইসাঁই শব্দ ভেসে আসছে। কান পাতলাম। শব্দটা আসছে এই তাঁবুর ভেতর থেকেই।

"উঠে বসলাম। হ্যারিকেনের পলতেটা বাড়িয়ে তাঁবুর ভেতরটায় ভাল করে চোখ বোলাতেই চমকে উঠলাম। অবাক কাণ্ড! সামনাসামনি মুখ-জোড়া মাটির সরাদুটো সারা ঘরময় গড়গড়িয়ে চরকি-পাক খাচ্ছে, আর ওর ভেতর থেকেই শব্দটা আসছে সাঁইসাঁই··· হুড়মুড়··· ঘড়ঘড়···

"ম্যাজিক নাকি! কিছুক্ষণ অবাক চোখে সরার দিকে তাকিয়ে থেকে তারপর মনে হল নিশ্চয়ই সরার জোড়ের মধ্যে কোনো বড়সড় পোকা বা ইঁদুর-টিদুর কিছু ঢুকেছে। ওরাই ভেতরে নড়েচড়ে গড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে সরা, আর সমানে শব্দ করছে। ভাবতেই স্বস্তি হল। ভাবলাম, সরাদুটোর জোড় খুলে বরং দেখাই যাক। অমন জিনিসের এমন কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব আছে বলে মনে হয় না। এই ভেবে মুখ-জোড়া সরাদুটো তুলে নিলাম হাতে, তারপর একটা লোহার খোন্তার সাহায্যে জোড়ের মুখে চাপ দিতে শুরু করলাম। কিন্তু কী ভীষণ টাইট রে বাবা! দুটো একেবারে শক্ত হয়ে এঁটে বসেছে। কিন্তু তাহলে পোকামাকড় ওটার মধ্যে ঢুকল কী করে!

"এদিকে সাঁইসাঁই··· হুড়হুড়··· ঘড়ঘড় শব্দটা ভেতরে হয়েই চলেছে, ব্যাপারটা কী? কৌতূহল যত বাড়তে লাগল, রহস্যভেদ করার জেদও ততই বেড়ে চলল। বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা-চরিত্তিরের পর একসময় সরার মুখটা ফটাশ করে খুলে গেল। দুটো সরা ছিটকে পড়ল দুদিকে। আর সঙ্গে-সঙ্গে আর এক আশ্চর্য কাণ্ড। সরার ভেতর থেকে কুলকুল করে বেরিয়ে আসতে লাগল রাশি-রাশি ধোঁয়া।

"কতকাল ওই পুঞ্জীভূত ধোঁয়া সরাদুটোর মধ্যে আটকে ছিল কে জানে? দেখতে দেখতে ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত তাঁবুটার মধ্যে। তারপর সেই ধোঁয়ার কুণ্ডলী একটু-একটু করে জমাট বাঁধতে শুরু করল। রূপ নিল এক-একটা মনুষ্যমূর্তির। একটা-দুটো নয়, গুনে-গুনে সতেরোটা মানুষের অবয়ব। ওদের প্রত্যেকেরই পোশাক-পরিচ্ছদ সৈনিকের মতো। লম্বাচওড়া চেহারা। কারুর গালে গালপাট্টা, কারুর বা শুধুই পাকানো গোঁফ। মাথায় উষ্ণীষ, বুকে বর্ম, হাতে খোলা তলোয়ার।

"ওরা আমাকে ঘিরে দাঁড়াল। আমি তো হতচকিত। এরা কারা! সরার ভেতর থেকে ধোঁয়া হয়ে বেরিয়েই বা এল কী করে! এ যেন সেই আরব্য উপন্যাসের দৈত্যর মতো। 'দৈত্য নই। আমরা সতেরো ঘোড়সওয়ারের ভূত।' বোধহয় আমার মনের কথাটা টের পেয়েই আমার সবচেয়ে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ভয়ংকর চেহারার জোয়ানটা বলল। দেখে মনে হয় ওই ওদের দলপতি। 'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ। আমিই এই সতেরোজনের সর্দার। আমার নাম ইসমাইল।' বাবা, এ তো দেখি মনের কথা সঙ্গে সঙ্গে টের পেয়ে উত্তর দিয়ে দেয়। বোধহয় মানুষ থেকে ভূত হলেই এই ক্ষমতা পাওয়া যায়। কিন্তু সতেরো ঘোড়সওয়ারের ভূত কথাটার অর্থ কী? সতেরো ঘোড়সওয়ার কারা? 'আমরা তুর্কস্তান থেকে হিন্দুস্তান এসেছি। আমাদের সেনাপতির নাম বখতিয়ার। তাঁরই পরিকল্পনা আর কৌশলে আমরা সতেরো ঘোড়সওয়ার সর্বপ্রথম নদীয়ায় প্রবেশ করে রাজা লক্ষ্মণ সেনের প্রাসাদ জয় করেছি।' ইসমাইল বক্স বলল।

"মনে পড়ল ইতিহাসের কথা। বহুকাল পর্যন্ত এই কিংবদন্তি প্রচলিত ছিল যে, মাত্র সতেরোজন ঘোড়সওয়ার সঙ্গে নিয়ে প্রায় আটশো বছর আগে বখতিয়ার খিলজি নদীয়া জয় করে সেন-বংশের বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণ সেনকে নদীয়া থেকে বিতাড়িত করেছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে এই বিবরণীকে ভ্রান্ত মনে করা হয়েছে। বলা হয়, সতেরো ঘোড়সওয়ার সর্বপ্রথম নদীয়ায় প্রবেশ করে থাকতে পারে, কিন্তু লক্ষ্মণ সেনের প্রকৃত পরাজয়ের কারণ তাঁর রাজ্যের ভেতরের বিশৃঙ্খলা এবং অনুচরদের বিশ্বাসঘাতকতা। তারাই সম্ভবত আমন্ত্রণ করে এনেছিল শত্রুদের।

"হ্যা-হ্যা-হ্যা-হ্যা করে সতেরোজন ঘোড়সওয়ারই হঠাৎ একসঙ্গে হেসে উঠল। আমি চমকে উঠতে ইসমাইল বলল, 'তোমাদের এখনকার ঐতিহাসিকরা ঠিকই বলে। আমরা সেবার কৌশলেই নদীয়া জয় করেছিলাম। আগে থেকেই সব পরিকল্পনা করা ছিল। তাই আমাদের নেতা বখতিয়ার তাঁর বিশাল সেনাবাহিনীকে নদীয়ার নগরপ্রাকার থেকে কিছু দূরে রেখে মাত্র আমাদের সতেরোজনকে নিয়েই ঢুকেছিলেন। বিশ্বাসঘাতকরা ভেবেছিল আমরা এলে ওদের স্বার্থসিদ্ধি হবে।' বলতে বলতে আবার সে হেসে উঠল হ্যা-হ্যা করে। অন্যরাও সে হাসিতে যোগ দিল।

"আমি বললাম, 'কিন্তু শেষপর্যন্ত তোমাদের এ-দশা হল কী করে? আটশো বছর ধরে এই মাটির সরা দুটোর মধ্যে তোমাদের ভূত বানিয়ে রেখে দিয়েছে কে?' সতেরো ঘোড়সওয়ারের নেতা ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে যে কাহিনী শোনাল, তা যেমন অদ্ভুত, তেমনি মজার।

"ওই সতেরো ঘোড়সওয়ার নদীয়া জয় করার পর থেকেই নগরে তাদের খাতির প্রতিপত্তি বেড়ে গেল। এমনিতেই বিজয়ী প্রতিপক্ষকে সবাই ভয় করে চলে, তার ওপর এরা

এক-একজন বিশালদেহী সৈনিক। ইসমাইলের দল অধিকৃত নদীয়ায় তাণ্ডব শুরু করে দিল। লুঠপাট খুনজখম চালিয়ে গেল। কেউ বাধা দেবার নেই। বখতিয়ার খিলজির ওই সতেরো ঘোড়সওয়ার ইচ্ছেমতো মানুষজনের মাথা কেটে নরক গুলজার করে তুলল।

"এই ভাবেই কাটল ক'টা দিন। তারপরই এল সতেরো ঘোড়সওয়ারের জীবনের চরম বিপর্যয়, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে। এবার সেই কথাটা বলি। সেদিন সকালেও গোসল সেরে খানা খেয়ে খোশ-মেজাজে সতেরো ঘোড়সওয়ার বেরিয়েছিল অন্যদিনের মতোই। ঘোড়ায় চেপে তলোয়ার ঘোরাতে-ঘোরাতে চলেছিল ইসমাইলের দল। পথে যা খুশি তাই করছিল।

"এইভাবে দুলকিচালে চলতে-চলতে সতেরো ঘোড়সওয়ার সেদিন হাজির হল নগর থেকে একটু দূরে নদীর ধারে এক নির্জন জায়গায়। হঠাৎ নজরে পড়ল এক অদ্ভুত দৃশ্য। নদীর ধারে প্রায় উলঙ্গ এক মানুষ মাটির মধ্যে নিজের মাথাটা ঢুকিয়ে দিয়ে সরু-সরু ঠ্যাঙদুটো ওপরে তুলে রেখে লিকলিকে হাত দুটো দু'পাশে ছড়িয়ে স্থির হয়ে রয়েছে।

"সতেরো ঘোড়সওয়ার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটার কাছে। তারপর ঘোড়া থেকে নেমে ঘিরে দাঁড়াল। এমন মজার দৃশ্য তারা আগে কখনও দেখেনি। লোকটা মাটির মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে পা'দুটো শূন্যে তুলে করছে কী ? বেঁচেই বা আছে কী করে ! লোকটার পাশে মাটির ওপর একটা কমণ্ডলু, চিমটে আর গোটা দুই মাটির সরা। সরায় রয়েছে কিছু ফলপাকুড়।

"আসলে মানুষটা ছিলেন একজন হঠযোগী সন্ন্যাসী। তখনকার দিনে এই ধরনের বিচিত্র ক্রিয়াকর্ম বেশ-কিছু সন্ন্যাসীর সাধনার অঙ্গ ছিল। অনেক আশ্চর্য কাণ্ডই তাঁরা ঘটাতে পারতেন। কিন্তু ইসমাইলের দল তখনও এ-দেশে নবাগত। তার ওপর মূর্খ সিপাই বই তো নয়। ওরা এত কিছু জানত না। ব্যাপারটা কৌতুকের বলেই ধরে নিল। তাই উৎপাত করার লোভ সামলাতে পারল না।

"ওরা প্রথমেই সন্ন্যাসীর সরা দুটোয় যে-সব ফলপাকুড় ছিল সবাই মিলে খেয়ে নিল, তারপর আরও নানা উৎপাত শুরু করল। কিন্তু হঠযোগী তখন গভীর যোগে তন্ময়। উৎপাতের মাত্রা বেড়েই চলল। কেউ কাতুকুতু, কেউ চিমটি, কেউ তলোয়ারের খোঁচা দিতেও ছাড়ল না।

"অবশেষে ধ্যানভঙ্গ হল যোগীর। মাটির ভেতর থেকে মাথা বার করে পা নামালেন শূন্য থেকে কাঠির মতো রোগা, মাথায় জটাজূট, একগাল দাড়ি। কিন্তু চোখের দৃষ্টি দেখে ওই সতেরো ঘোড়সওয়ার সৈনিকেরও হৃৎকম্প জাগল। জবাফুলের মতো টকটকে লাল চোখ দুটো বিস্ফারিত করে সেই সন্ন্যাসী হেঁকে উঠলেন, 'কে তোরা ?'

"সতেরো ঘোড়সওয়ার তখন বেশ হকচকিয়ে গেছে। এমন অভিজ্ঞতা ওদের এই প্রথম। সন্ন্যাসী এবার ওদের প্রত্যেকের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকালেন সেই সরা দুটোর দিকে। ফলপাকুড় যা ছিল, একটু আগেই খেয়ে সরা দুটো ফাঁকা করে রেখেছে ওরা। দেখতে দেখতে যোগী সন্ন্যাসীর দু-চোখের তারায় এবার যেন জ্বলে উঠল অগ্নিশিখা। তারপরই হঠাৎ একটা সরা এক হাতে তুলে নিয়ে অন্যহাতে

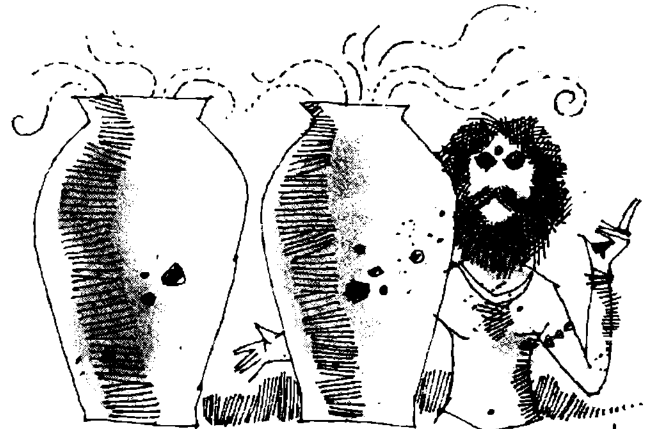

কমণ্ডলু থেকে জল তুলে ছিটিয়ে দিলেন ওই সতেরোজনের শরীরে। সঙ্গে-সঙ্গে সেই সতেরো ঘোড়সওয়ারের শরীরগুলো যেন হাল্কা পালকের মতো হয়ে গেল। তারপর কী এক আশ্চর্য আকর্ষণে দেহ ছেড়ে ওদের সূক্ষ্ম শরীর ভাসতে-ভাসতে গিয়ে ঢুকে পড়ল দুই সরার মধ্যে।

"সাধু সরা দুটো সামনাসামনি বন্ধ করতে-করতে চিৎকার করে বললেন, 'দুর্বিনীতের দল, ভেবেছিলি তলোয়ারের শক্তিতে যা খুশি করতে পারিস! তোরা সতেরোটা ঘোড়সওয়ার বন্দী থাক এই ছোট্ট সরা দুটোর মধ্যে। বন্দী থাকবি, যতদিন না দেশটা স্বাধীন হয়, আর কেউ এসে তোদের মুক্তি দেয়।'

"'আটশো বছর বাদে ওই অসহ্য বন্দীদশা থেকে আপনি আমাদের মুক্তি দিয়েছেন। আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।' বলতে বলতে সতেরো ঘোড়সওয়ারের ভূতের সর্দার ইসমাইল তার মাথাটা নুইয়ে দাঁড়াল আমার সামনে।

"তার মিনিট-খানেকের মধ্যেই সতেরো ঘোড়সওয়ারের ভূতেরা। সতেরোটা আরশোলা হয়ে ফরফর করে উড়ে গেল রাতের অন্ধকারে তাঁবুর বাইরে।

"আমার যখন চমক ভাঙল তখন দেখি নিঝুম রাতে তাঁবুর মধ্যে আমি একা বসে রয়েছি। হ্যারিকেনের শিখাটা দপ-দপ করছে। বোধহয় তেল ফুরিয়ে এসেছে। কাঁচের গায়ে কালো ধোঁয়ার স্তর।"

শিবুখুড়ো গল্প শেষ করলেন। আমরা নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচায়ি করলাম, কিন্তু কিছু মন্তব্য করতে ভয়সা পেলাম না। একটু বাদে পাঁচুই জিজ্ঞেস করল, "ঘটনাটা কি ১৯৪৭ সালের পরেই ঘটেছিল ?"

"আলবত।" শিবুখুড়ো উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "হঠযোগীর অভিশাপ ছিল, যতদিন না দেশ স্বাধীন হয় ততদিন সতেরো ঘোড়সওয়ারের ভূত মুক্তি পাবে না। সে অভিশাপের কাল পূর্ণ হয়েছে।"

কিন্তু শিবুখুড়োর কথা শেষ হল না, পাশের রান্নাঘর থেকে ফরফর করে উড়ে এল আরশোলার ঝাঁক। ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে।

আমাদের মধ্যে মণিকারই আরশোলা-ভীতি সবচেয়ে বেশি। ও তো পরিত্রাহি চিৎকার লাফালাফি শুরু করে দিল। একটু বাদে আরশোলাদের তাড়ানো গেল। কিন্তু তাকিয়ে দেখি, শিবুখুড়ো কখন যেন চলে গেছেন।

বাইরে বৃষ্টিটা থেমেছে, কিন্তু আকাশ তখনও ঘোলাটে!

ছবি : দেবাশিস দেব

ধাঁধা

ঘুরে-ফিরে হাতে এল কিনা সেই বয়সেরই অঙ্ক। হ্যাঁ, অঙ্কই। অঙ্ক ছাড়া আবার কী। এই নিয়েই ক'দিন আগে ছোট্‌কাকে বলেছিলাম। সেবার অবশ্য ছোট্‌কা বোকা বানিয়ে দিয়েছিল সঙ্গে-সঙ্গে। বয়স বার করার ব্যাপারটাকে যে যথেষ্ট ধাঁধানো করে তোলা যায়, আর ধাঁধা বলতে তখন যে আর আপত্তি থাকে না, সেই প্রমাণই দিয়েছিল ছোট্‌কা সেবার। একেবারে যাকে বলে হাতেনাতে। সেইজন্যই বুঝি এবার ছোট্‌কা যে-ধাঁধাটা রেখে গেছে, সেটা সেই বয়স বার করার ধাঁধা (ওরফে অঙ্ক)। একেবারে সরাসরি। কোনো আড়াল-আবডাল নেই।

কী আর করা। প্রথমত, ছোট্‌কা নেই। অফিসের কাজে দিল্লি চলে গেছে। কবে ফিরবে বলে যেতে পারেনি। দ্বিতীয়ত, এটা নিয়ে আপত্তি করলে ছোট্‌কা হয়তো আবার নতুনভাবে বোকা বানিয়ে ছেড়ে দেবে। তাই, সেই ধাঁধাটাই অবিকল দিয়ে দিচ্ছি।

প্রথম ধাঁধা ॥ বুবুনের জন্মদিনে বুবুনই হিসেব করে দেখল ব্যাপারটা। দেখল, বুবুনের এখন যে-বয়স, বাবার বয়স তার চারগুণ বেশি।

ঠিক কুড়ি বছর বাদে কিন্তু অন্যরকম হিসেব হচ্ছে। বুবুনের বয়সের দ্বিগুণ-বয়সী হচ্ছেন বাবা তখন।

এখন তাহলে কত বয়স বুবুনের? বাবারই বা কত?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ পরের সংখ্যাটা কত হবে?

১, ৩, ৪, ৬, ৭, ৯, –

তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও—

রাতচিচরি

গতবারের উত্তর ॥ (১) খ। (২) ৪৪৪+৪৪+৪+৪+৪=৫০০। (৩) মুখরোচক।

সত্যসন্ধ

শব্দ-সন্ধান

১		২		৩		৪
	■		■		■	
	■	৫	৬		■	
৭		■		■	৮	
	■	৯		১০	■	
	■		■		■	
১১			■	১২		

সংকেত : পাশাপাশি : (১) এশীয় রাশিয়ার একটি রাজ্য। (৫) বিনাশ। (৭) শিশির বা তুষার। (৮) পুঁতির মতো ছোট ফল। (৯) মেয়েদের উত্তরীয়। (১১) সমুদ্র। (১২) সোনা।

উপর-নীচ : (১) নেতাজি গঠন করেছিলেন। (২) বিদেশে পণ্য পাঠানো। (৩) লোহার রূপান্তর। (৪) বিখ্যাত এক বাঙালি কবি। (৬) দূর থেকে মেঘের মতো দেখায়। (৯) ফল দেয় একবার, তারপর নেই আর। (১০) ছোট নাটক।

রঞ্জন

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

অ	র্য	মা	■	ভে	ট	কি
গু	■	ঝি	নু	ক	■	রী
রু	■	■	র	■	■	ট
■	ড়	বো	জা	হা	জ	■
বা	বু	■	হা	■	লৌ	হ
ছু	রি	■	ন	■	কা	জ
র	■	■	■	■	■	মি

মজার খেলা

এবারের খেলাটার জন্য চাই শুধু ২০টি টুথপিক অথবা দেশলাইকাঠি। কাঠি কুড়িটাকে নীচের ছবির মতন সাজাও—

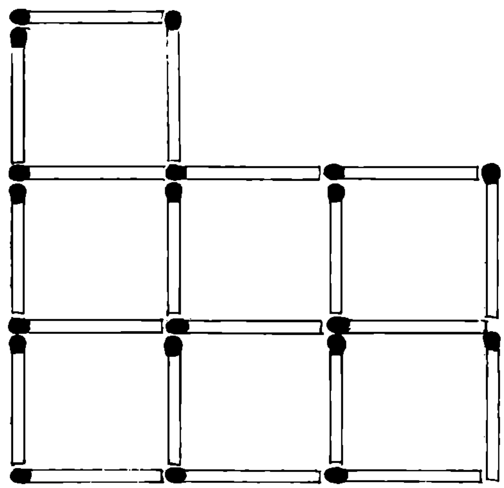

এবার কোনো বন্ধুকে বলো, এর থেকে তিনটে কাঠি সরিয়ে আবার এমনভাবে বসাতে হবে, যাতে কিনা টেবিলে থাকে মাত্র পাঁচটা বর্গক্ষেত্র। বর্গক্ষেত্রগুলো যেন একে অন্যকে ছুঁয়ে থাকে—এটাও একটা শর্ত।

দেখবে সাত বর্গক্ষেত্রকে পাঁচ বর্গক্ষেত্রে, সব শর্ত মেনে, নিয়ে যেতে কী হিমসিমই না খাচ্ছে তোমার বন্ধু। পারবে না বলেই মনে হয়। হয়তো বলে উঠবে, "না বাবা, সাতে-পাঁচে থাকা যে ভাল নয়, সাধে কি বলে ? আমি এর মধ্যে নেই।"

কিন্তু এ তো হল কথার চালাকি। আসল উত্তর এটা নয়। আসল উত্তর কী বলো তো ? সেটা হল এইরকম—

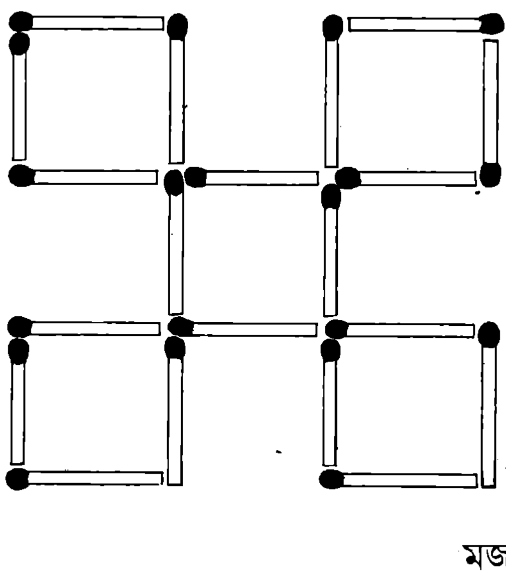

মজারু

হাসিখুশি

"আমি যখন তোমার মতো ছিলাম তখন আমার পুরো ইংরেজি অভিধান মুখস্থ ছিল।"

"সেইজন্যেই বুঝি আপনি সেদিন উটপাখির ইংরেজি বলেছিলেন ক্যামেল বার্ড ?"

"বুবাই, তুমি এক কানে তুলো গুঁজে রেখেছ কেন ?"

"আপনিই তো স্যার রোজ রোজ বলেন, ক্লাসে যা পড়ানো হয়, তা নাকি আমার এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। তাই একটা কান বন্ধ করে রেখেছি।"

"আগের কোম্পানিতে আপনি কতদিন কাজ করেছেন ?"

"অফিসের ক্যাশবাক্স ভাঙার জন্য যেদিন ম্যানেজারবাবু ঘাড়ধাক্কা দিলেন সেদিন পর্যন্ত।"

"বাঃ, ছাতাটা তো বেশ সুন্দর ! কোথায় পেলে ?"

"বোন দিয়েছে।"

"কিন্তু তুমিই তো একবার বলেছিলে তোমার কোনো বোন নেই !"

"তা বলেছিলাম বটে। কিন্তু ছাতাটার হাতলে যে লেখা রয়েছে, 'আমার প্রিয় দাদাকে : সুজাতা'।"

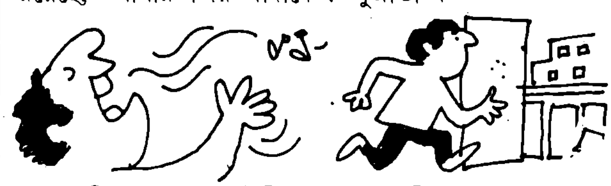

"আমি যখন গান গাইছিলাম তখন তুমি বারবার বারান্দায় বেরিয়ে যাচ্ছিলে। আমার গান কি তোমার ভাল লাগছিল না ?"

"না না, সেজন্যে নয়। আমি তোমার প্রতিবেশীদের জানাতে চাইছিলাম যে, আমি তোমাকে মারছি না।"

"কদিন ধরেই মনটা খুব চঞ্চল। হস্তরেখাবিদ না মনোবিজ্ঞানী—কার কাছে যাওয়া যায় বলো তো ?"

"তুমি বরং হস্তরেখাবিদের কাছেই যাও। সে তবু তোমার হাতটা দেখতে পাবে।"

"চোর চুরি করে পালাল। আপনি দেখতে পেয়েও তাকে ধরলেন না ?"

"মার খাওয়ার ভয়ে মশাই। তখন যদি বুঝতে পারতাম চোরটা আমার পাড়ার নয়, অন্য পাড়ার, তাহলে কি আর ছেড়ে দিতাম ?"

ছবি : দেবাশিস দেব

তোমরা যদি সত্যিই ডাকটিকিট ভালোবাসো তো এটা পড়ে দেখো ...

বিনামূল্যে ! অতিরিক্ত ১০টি স্ট্যাম্প, প্রত্যেক অর্ডারে

এখন এই ডাকটিকিটগুলির যে-কোনোটি তোমাদের নিজেদের হতে পারে— এছাড়া আরও শত শত ডাকটিকিটের মধ্যে থেকে পছন্দমতো বেছে নেওয়ার সুযোগ

তোমাদের মতো ডাকটিকিটের খাঁটি সমঝদারও দেখে চমকে যাবে চিনার-এর কাছে এমন অবিশ্বাস্য সুন্দর সব ডাকটিকিট আছে। পুরোনো ও নতুন, মোহর দেওয়া ও ব্যবহৃত কত রকম ডিজাইন, রং ও আকারের সে-সব ডাকটিকিট—তোমাদের মনে হবে আগে কখনো দেখনি! বিষয়ের ব্যাপ্তিও বিশাল, মহাকাশ ও খেলাধুলো থেকে শুরু করে সোভিয়েত দেশের ইতিহাস পর্যন্ত।
এগুলো জোগাড় করাও খুব সোজা। কুপনটি ভর্তি করে চিনার-এর কাছে পাঠিয়ে দাও—কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদের স্ট্যাম্প প্যাকেট ভি পি পি-তে তোমাদের বাড়ি পৌঁছে যাবে।

তোমাদের জন্যে "হাতে পেলে টাকা দেবে" সুযোগ

এখন একটি পয়সাও দেবে না। শুধু কুপনটি ভর্তি করে পাঠিয়ে দাও। তারপর বাড়িতে পোস্টম্যান প্যাকেট নিয়ে এলে তাকে টাকা দিয়ে দিও।

কে এই চিনার ?

— ভারতে ডাকটিকিটের অগ্রণী আমদানি ও রপ্তানিকারক।
— ইউ এস এস আর থেকে আসা ডাকটিকিটের একমাত্র ভারতীয় ডিস্ট্রিবিউটর।
— তোমাদের সংগ্রহ গড়ে তুলতে সাহায্যকারী এক সংস্থা।
— এই সংস্থা প্রকৃত সংগ্রাহকদের জন্য অবিরাম নতুন ডাকটিকিট সংগ্রহ করে চলে।

ন্যূনতম অর্ডার ২৫ টাকা।৫০ টাকা অথবা তদূর্ধ্বের অর্ডারের ক্ষেত্রে ডাকব্যয় লাগে না। ১০% বিক্রয়কর আলাদা।

তাড়াতাড়ি তোমাদের কুপন ডাকে পাঠিয়ে দাও।

যে বিষয়ের ও যতটির প্যাকেট চাও, তাতে গোল দাগ দাও

বিষয়	১০	২৫	৫০	১০০ ডাক টিকিট
☐ মহাকাশ	৩·৭৫	৮·০০	১৫·০০	৩৫·০০
☐ খেলাধুলা	৩·৭৫	৮·০০	১৫·০০	৩৫·০০
☐ পরিবহণ	৩·৭৫	৮·০০	১৫·০০	৩৫·০০
☐ শিল্প	৩·৭৫	৮·০০	১৫·০০	৩৫·০০
☐ ফুল	৩·৭৫	৮·০০	১৫·০০	৩৫·০০
☐ জীবজন্তু	৩·৭৫	৮·০০	১৫·০০	৩৫·০০
☐ জলযান/ সমুদ্র-জীবন	৩·৭৫	৮·০০	১৫·০০	৩০·০০ *
☐ চিত্রকলা	৩·৭৫	৮·০০	১৫·০০	—
☐ লেনিন	৩·৭৫	৮·০০	১৫·০০	২৫·০০ **
☐ মস্কো	—	—	—	৩০·০০
☐ সাইবেরিয়া ও দূরপ্রাচ্য	—	—	৩০·০০ ***	—
☐ শান্তি ও মৈত্রী	—	৮·০০	—	২৫·০০
☐ অক্টোবর বিপ্লব	৩·৭৫	—	—	২৫·০০
☐ নানারকম	৩·৭৫	৮·০০	১৫·০০	২৫·০০

* ৯০টি স্ট্যাম্প ** ৮৫টি স্ট্যাম্প *** ৫৩টি স্ট্যাম্প

নাম ....
বয়স .... স্কুল ....
বাড়ির ঠিকানা ....

চিনার —
অসংখ্য সংগ্রাহকের জন্য
অজস্র ডাকটিকিট
আমদানি করে— প্রতিদিন।

চিনার এক্সপোর্টস প্রাঃ লিঃ
১০১এ, সূর্য কিরণ
কস্তুরবা গান্ধী মার্গ,
নয়া দিল্লি-১১০ ০০১।

ডাকটিকিট—এর সংগ্রহ তোমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে ওঠে।

F.N/XIII-546

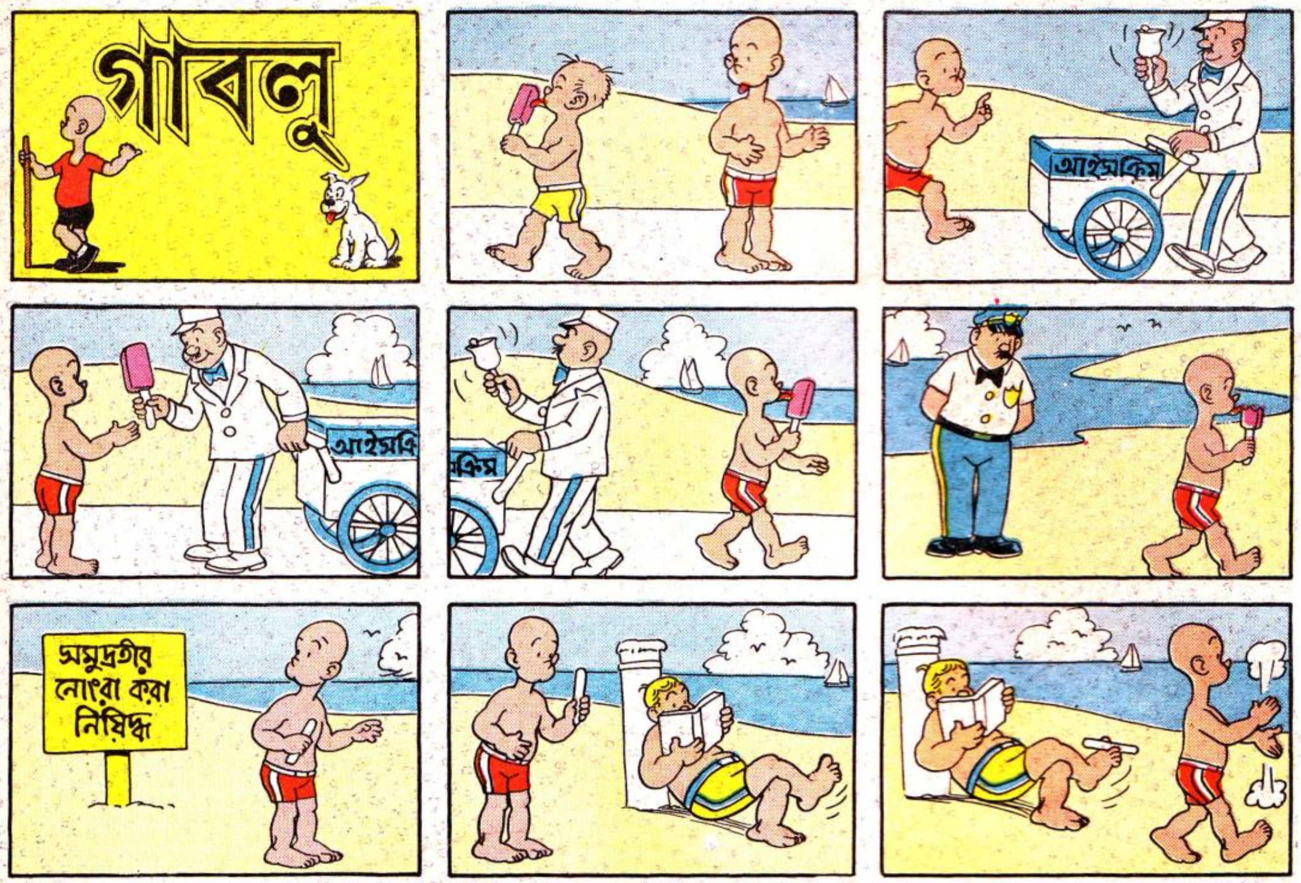
গাবলু
আইসক্রিম
সমুদ্রতীর নোংরা করা নিষিদ্ধ

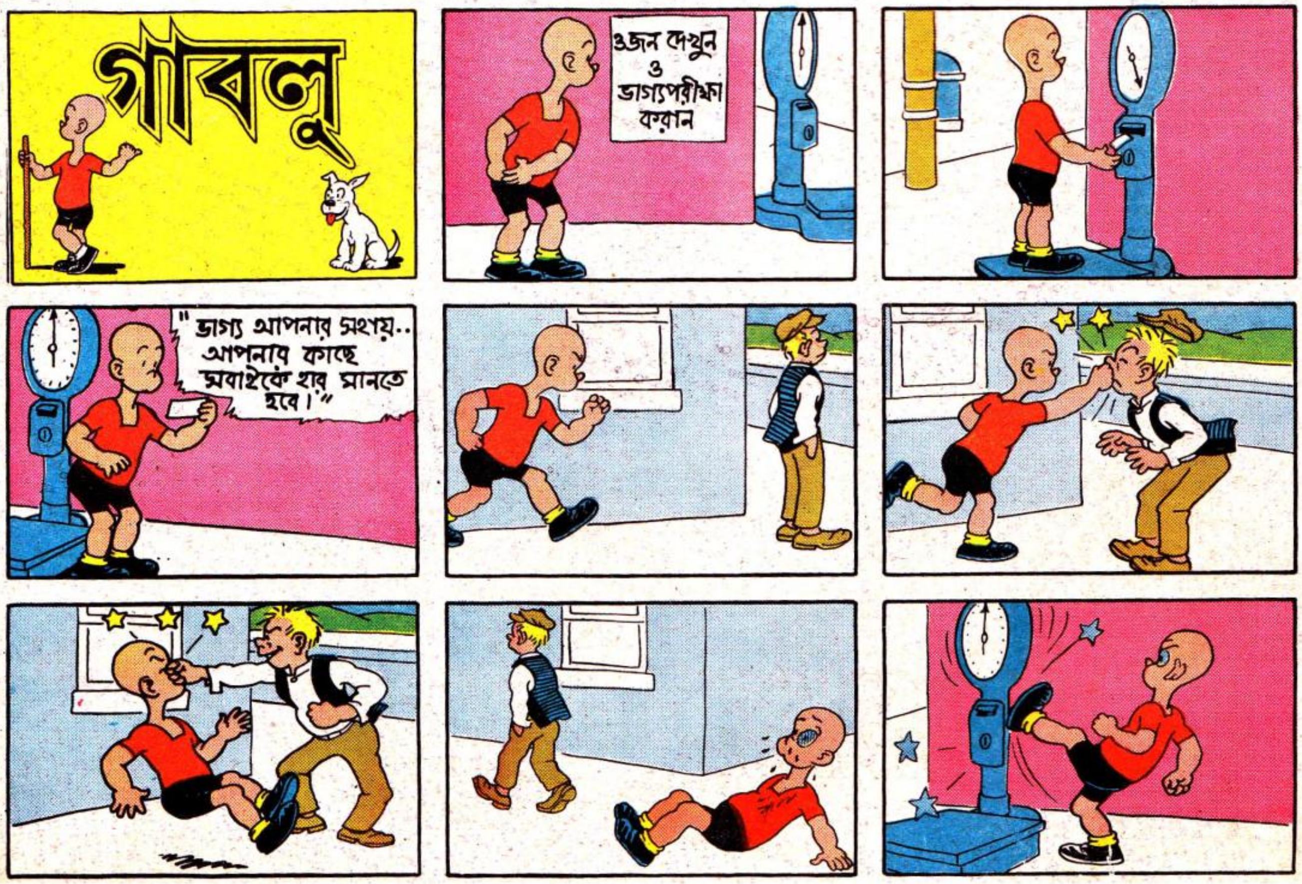
গাবলু
ওজন দেখুন ও ভাগ্যপরীক্ষা করান
"ভাগ্য আপনার সহায়.. আপনার কাছে সবাইকে হার মানতে হবে।"

ইডেনে ক্রিকেট খুন

রাজা গুপ্ত

অন্তত শুরুতে কী ছিল না ইডেনে ? বিপক্ষ বোলিংকে নির্বিষ করার জন্যে ভারত অধিনায়কের নির্দেশমতো ঘাসহীন ন্যাড়া পিচ, আশি হাজার কণ্ঠে অবিরাম সমর্থন। আর ছিল পত্রপত্রিকার পাতা জুড়ে বড়-বড় ছবি ও প্রশংসার ঝড়। কিন্তু দুনিয়ার যাবতীয় সুযোগ হাতে পেয়েও ভারতীয় ক্রিকেটাররা কী দিলেন ইডেনে ? রেকর্ড গড়ার কারিগররা স্বার্থপরের মতো যে ক্রিকেট খেললেন, তা ভারতবর্ষের মুখ নিশ্চয় উজ্জ্বল করবে না।

এ-কথা সত্যি, সাংবাদিক এবং 'কমপ্লিমেণ্টারি' কার্ডধারীদের বাদ দিয়ে ইডেনে উপস্থিত আশি হাজার দর্শককেই টিকিট কেটে মাঠে ঢুকতে হয়েছে ! এবং এ-কথাও সত্যি, তাঁরা সকলেই এসেছিলেন ক্রিকেটের আনন্দ উপভোগ করতে। বিনিময়ে পেলেন ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের দেওয়া সীমাহীন নির্যাতন। খুব ঠাণ্ডা মাথায় ইডেনে ক্রিকেটকে খুন করে গেলেন কয়েকজন ভারতীয় ক্রিকেটার। দর্শকদের অর্থ, সময় এবং অপেক্ষার কোনো মূল্যই দিলেন না তাঁরা !

মরা ক্রিকেট, তাই মাঠে কাগজ-পড়া

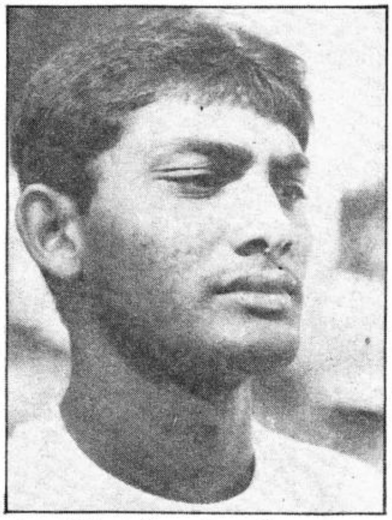

আজহারউদ্দিন (অভিষেকেই সেঞ্চুরি)

কলকাতা টেস্টের শুরুর মুহূর্ত থেকে ইডেনে শব্দ উঠেছে : 'উই ওয়ান্ট কপিলদেব'। শেষ দু'দিনে বিক্ষোভটা পৌঁছায় গর্জনে। প্রমাণ হয়ে গেল কলকাতায় কপিলের জনপ্রিয়তা কতখানি। কিন্তু মহানুভব নির্বাচকদের উদাসীনতা এবং গাওস্করের প্ররোচনায় ভারতীয় ক্রিকেটের একমাত্র স্ট্রাইক বোলারটিকে রাখা হল টিমের বাইরে, দলের শ্রেষ্ঠ স্বার্থের দিকটি উপেক্ষা করে।

ইডেনের বিরক্তিকর ক্রিকেট নিয়ে কিছুই লেখার নেই। শুধু ওরই মধ্যে যে জিনিসটি ভোলার নয়, সেটি মহম্মদ আজহারউদ্দিনের শতরান। ইডেনে অভিষিক্ত হয়েই সেঞ্চুরি করে ফেললেন আজহার। ছিপছিপে এই তরুণ হায়দরাবাদী ক্রিকেটারের হাত খুলে মারের ব্যাপারে উৎসাহ আছে। তবে এ-কথা তাঁকে অবশ্যই দ্রুত বুঝে নিতে হবে যে, টেস্টমানের ফিল্ডিংয়ের আঁটোসাটো বাঁধন ছেঁড়ার জন্যে শুধু জোরে বল হিট্ করলেই চলবে না, দুটি ফিল্ডারের মাঝ-বরাবর বল প্লেস করার কৌশলটিও আয়ত্ত করতে হবে। রবি শাস্ত্রীও এই টেস্টে সেঞ্চুরি করেছেন। তবে সেটি এসেছে পঁচানব্বই বছরের বৃদ্ধের পথচলার ভঙ্গিতে।

এই টেস্টে অধিনায়ক গাওস্করের ভূমিকাটি আদ্যন্ত আদর্শহীন আচরণে ভরা। অধিনায়কের পদে নিরাপদ থাকার চেষ্টায় ইতিপূর্বেও গাওস্কর নিরুত্তেজ ক্রিকেটকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। এবার বোধহয় চূড়ান্ত অবিবেচনার কাজ করলেন ইনিংস ঘোষণায় অহেতুক দেরি করে। যে-ম্যাচের একটি দিন বৃষ্টি ছেঁটে দিয়েছে, সেই মরা ম্যাচ বাঁচাতে গাওস্করের দিক থেকে কোনও উদ্যোগ আসেনি, গোটা কলকাতা তাই তাঁর উপরে ক্রুদ্ধ।

সেঞ্চুরির পথে আজহার

ইডেনে অধিনায়ক গাওস্কর যে ধরনের ভয়ংকর বিক্ষোভের মুখে পড়েছেন, আর কোনও ক্রিকেটার তেমন জনরোষের মুখে পড়েছেন বলে আমার জানা নেই। প্রিয় ক্রিকেটার সুনীল গাওস্করের বিরুদ্ধে এই ক্ষোভ প্রমাণ করে দিল, নাম নয়, দর্শকদের কাছে ক্রিকেট খেলাই বড়। এবং তার চেয়েও বড় ভারতবর্ষের সম্মান।

জয়ের রথ রুখে দিল অস্ট্রেলিয়া

সম্রাট রায়

জয় নয়, অস্ট্রেলিয়া মরিয়া হয়ে মেলবোর্নে একটা ড্র খুঁজে নিতে চেয়েছিল। সিরিজের মীমাংসা হয়ে গেছে আগেই। তবু বিপক্ষ দুই অধিনায়কই সম্পূর্ণ আলাদা মনোভাব নিয়ে হাজির হয়েছিলেন মেলবোর্নে। ক্লাইভ লয়েড চেয়েছিলেন মার্জিনটাকে বাড়িয়ে ৪-০ করে জয়ের ধারাটিকে ধরে রাখতে। আর নতুন অধিনায়ক অ্যালান বর্ডার কোনোরকমে একটি ড্র করে বিশ্বত্রাস ওয়েস্ট ইণ্ডিজের হাত থেকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়াকে।

মেলবোর্নে রীতিমত সাড়া জাগিয়েই শুরু করেছিল অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু মাত্র ১৫৪ রানের মধ্যে পাঁচ ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানকে ফেরত পাঠিয়েও পুরো

অ্যালান বর্ডার (অস্ট্রেলিয়ার নতুন অধিনায়ক)

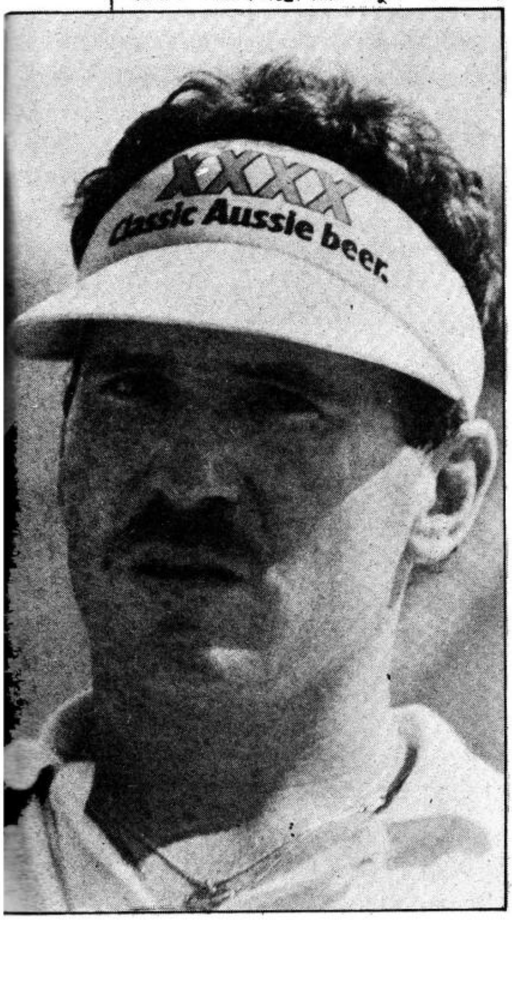

সুযোগ নিতে পারল না। কারণ গ্রিনিজ, হেনস্, রিচার্ডসন, দুজোঁ, লয়েড ফিরে গেলেও ব্যাট হাতে তখনও ইনিংসটি পাহারা দিচ্ছিলেন ভিভ্ রিচার্ডস। এই সিরিজে ভিভের ব্যাট ছিল রানহীন। তাই 'ব্যাটদানবের' ফুঁসে ওঠাটা ছিল জরুরি। রিচার্ডস বেছে নিলেন এই সময়টাই, যখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ইনিংসের ওপর চলছে অস্ট্রেলিয়ান বোলারদের হামলা। হামলা সামলাতে রিচার্ডসের ব্যাট ঘুরতে শুরু করল। বলাবাহুল্য, সেই সঙ্গে ঘুরতে শুরু হল স্কোরবোর্ডের চাকাও। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ থামল ৪৭৯ রানে। রিচার্ডস বেদম পিটিয়ে করলেন ২০৮ রান। মেলবোর্ন মাঠে অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সিরিজে এইটাই সর্বোচ্চ ইনিংস হিসেবে চিহ্নিত হল। চিহ্নিত হলেন আরেকজনও, তিনি, ম্যাকডারমট। প্রথম টেস্ট খেলতে নেমেই তিনটি উইকেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটে নতুন বাতাসের সন্ধান দিলেন তিনি।

হিলডিচ (৭০) আর ওয়েসেলসের (৯০) চোয়াল-চাপা লড়াইয়ের মনোভাব অস্ট্রেলিয়াকে ১৬১ রানে পৌঁছে দিল। কিন্তু তারপরেই অস্ট্রেলিয়ান ইনিংস পিছলে শেষ হল ২৯৬ রানে। সেই ম্যালকম মার্শাল, গোটা সিরিজ ধরে যিনি অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যানদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছেন, তিনি নিলেন পাঁচ উইকেট।

অস্ট্রেলিয়া ফলো-অন বাঁচিয়ে ফেলায় এবং দ্বিতীয় দফাতেও মাত্র একশো রানে পাঁচ উইকেট হারানোর ফলে (প্রথম ইনিংসে ডবল সেঞ্চুরিকারী রিচার্ডস দ্বিতীয় ইনিংসে শূন্য) ওয়েস্ট ইণ্ডিজ কিছুটা বিপাকে পড়ে। ফলে লয়েড এবং দুজোঁকে ইনিংস সামাল দেবার বাড়তি ঝক্কিটুকু ঘাড়ে নিতেই হল। কিন্তু চতুর্থ দিনের শেষে ১৬৩ রানে পৌঁছে মোট ৩৪৬ রানে এগিয়ে থেকেও ইনিংস ডিক্লেয়ার না করে শেষ দিনের সকালে আরও পঁচিশ মিনিট ব্যাট

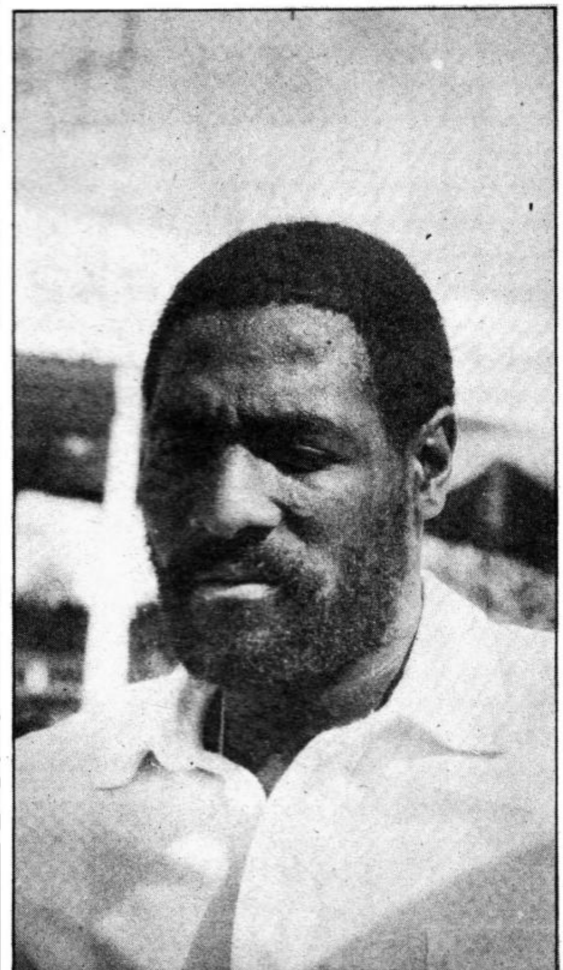

ভিভ্ রিচার্ডস (রানে ফিরেছেন)

করলেন লয়েড। এর ফলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ যতটা না এগিয়ে গেল, সেই তুলনায় হারাল মহামূল্যবান অনেকটা সময়।

দ্বিতীয় দফায় প্রতিরোধের পাঁচিল গড়ার কাজে অস্ট্রেলিয়ানদের নেমে পড়তেই হল। কারণ শেষ পর্যন্ত পঞ্চম দিনটি দাঁড়াল অস্ট্রেলিয়ার আঁকড়ে থাকার এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ছিনিয়ে নেবার লড়াই। গার্নার, ওয়ালশ, মার্শালদের 'মিসাইল' জব্দ হল অ্যানড্রু হিল্‌ডিচের সাহসী ব্যাটে। অসাধারণ সেঞ্চুরি করলেন হিল্‌ডিচ (১১৩)। বলাবাহুল্য, কোনো শব্দই এই অনবদ্য সংগ্রামের শেষ বিশেষণ নয়। এই একটি শতরান রুখে দিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজের একটানা জয়ের রথচক্রকে। শেষ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ান ইনিংস আটকে রইল ৮ উইকেটে ১৯৮ রানে।

প্রশ্ন থেকে গেল অনেকেরই মনে, পঞ্চম দিনের সকালে পঁচিশ মিনিট ব্যাট করে লয়েড কি ভুল করলেন?

রবীন্দ্রকন্যা মাধুরীলতার গল্প আর চিঠি—

মাধুরীলতা রবীন্দ্রনাথের মেয়ে, এটা একটা পরিচয়। আরেকটি বড়ো পরিচয়, মাধুরীলতা খুব সুন্দর সব গল্প লিখেছেন। 'ওর ক্ষমতা ছিল'—মেয়ের গল্প-লেখা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিকে সম্পূর্ণ যথার্থ মনে হয়, "মাধুরীলতার গল্প" বইটি পড়লে। কী সুন্দর ভাষা, কী সুন্দর বিষয়। আরেকটি সুন্দর বই 'মাধুরীলতার চিঠি'। যেন আরেক রবীন্দ্রনাথকে পাই আমরা, যে-রবীন্দ্রনাথ সংসারী, কন্যার আবদার রাখেন, মেয়েকে উপদেশ দেন বিবাহ পরবর্তী জীবনের জন্য। দুটি বই-ই সম্পাদনা করেছেন পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

মাধুরীলতার দুটি বই

পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় সংকলিত

মাধুরীলতার চিঠি ৫·০০
মাধুরীলতার গল্প ৬·০০

শুধু বনের নয়, ছোটদের মনেরও শিকারী বুদ্ধদেব গুহ

বুদ্ধদেব গুহ নিজে দারুণ শিকারী। শিকার-কাহিনী লেখাতেও তাঁর জুড়ি নেই। তাঁর শিকার নিয়ে লেখার মজা হল, একটি ছোট্ট ছেলের চোখের বিস্ময়, মনের অনুভব আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা অদ্ভুত অন্তরঙ্গভাবে ফুটিয়ে তোলেন তিনি, বড়োদের গাম্ভীর্য নিয়ে দূর থেকে গল্প বলেন না। সেই ছেলেটির নাম রুদ্র, আর এই ক্ষুদে শিকারী যার সাকরেদ, সেই বড়ো শিকারী হলেন ঋজুদা। এতকাল ঋজুদা আর রুদ্রর নানান গল্পই আমরা শুনেছি, এ-জঙ্গলে, ও-জঙ্গলে, এমন-কি আফ্রিকার গুগুনোগুম্বারের দেশের গল্পও, নতুন বই 'টাঁড় বাঘোয়া'য় বুদ্ধদেব গুহ শোনালেন তাঁর নিজের ছেলেবেলারই এক দুর্দান্ত শিকারকাহিনী। এ-গল্পেরও জবাব নেই।

আর, সব-নতুন 'ঋভুর শ্রাবণ'? যেন এক নতুন পথের পাঁচালী।

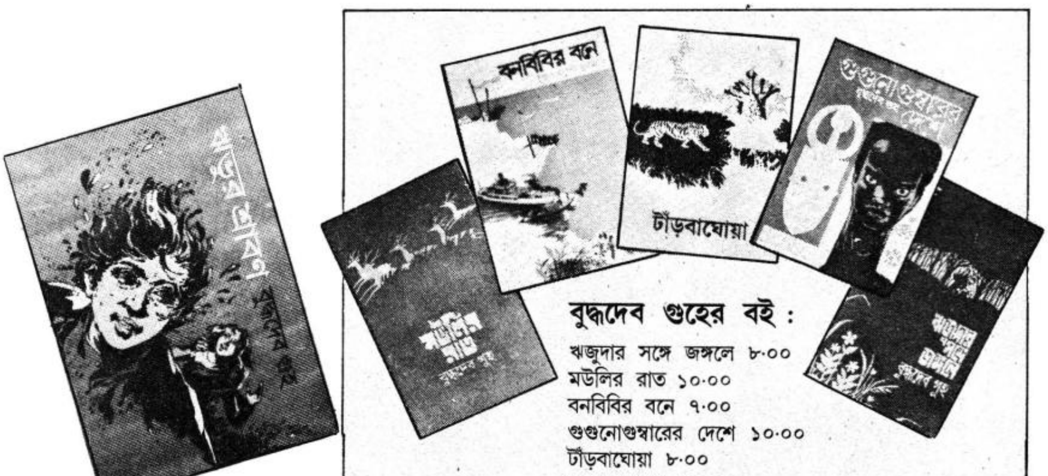

বুদ্ধদেব গুহের বই :

ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে ৮·০০
মউলির রাত ১০·০০
বনবিবির বনে ৭·০০
গুগুনোগুম্বারের দেশে ১০·০০
টাঁড়বাঘোয়া ৮·০০
ঋভুর শ্রাবণ ১০·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ পর্যুদস্ত

শ্যামসুন্দর ঘোষ

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মতো শক্তিশালী দলকে শেষ পর্যন্ত টেস্টে পরাজয় স্বীকার করতে হল। অস্ট্রেলিয়ার কাছে সিডনি টেস্টে তাদের এই পরাজয় শুধু অপ্রত্যাশিত নয়, অকল্পনীয়। কারণ, পাঁচ টেস্ট সিরিজের প্রথম তিনটি টেস্টে অস্ট্রেলিয়া হেরেছে শোচনীয়ভাবে। চতুর্থ টেস্টে অস্ট্রেলিয়া হার বাঁচিয়েছে কোনওরকমে। আর শেষ টেস্টে অস্ট্রেলিয়া জিতেছে ইনিংস ও ৫৫ রানে।

সাম্প্রতিককালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের খেলোয়াড়রা ব্যাটে-বলে যে দক্ষতা দেখিয়েছেন, নিঃসন্দেহে তা টেস্ট ক্রিকেটের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। সিডনি টেস্টে পরাজয়ের আগে সাতাশটি টেস্টের মধ্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জিতেছিল সতেরোটি টেস্টে। বাকি দশটি টেস্ট শেষ হয়েছিল অমীমাংসিতভাবে। সতেরোটি টেস্টের মধ্যে ছটি টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জয় এসেছে ইনিংসে। অপর ছটি টেস্টে আট

অস্ট্রেলিয়ার নতুন অধিনায়ক বর্ডার (ওয়েস্ট ইণ্ডিজের একটানা জয় রোধ করেছেন)

ক্লাইভ লয়েড (বিদায়, টেস্ট-ক্রিকেট)

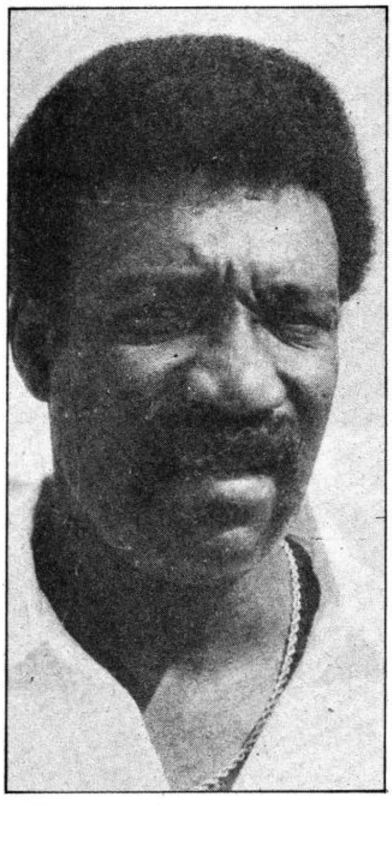

বা তার বেশি উইকেটের ব্যবধানে। বলতে গেলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এই ধরনের ব্যাটিং বিপর্যয় ঘটেছিল ১৯৬৮-৬৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিল লরির দলের কাছে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলে প্রথম যে ছজন ব্যাটসম্যান রয়েছেন, সেই গ্রিনিজ, হেন্‌স, রিচার্ডস, লয়েডস, গোম্‌স ও দুজোঁর টেস্ট ক্রিকেটের রান যদি একত্র করা যায়, তা হলে দেখা যাবে সংখ্যাটি ইতিমধ্যে ২৪ হাজার অতিক্রম করেছে। কিন্তু এই শক্তিশালী ব্যাটিং-বাহিনীকেও দু-দুবার হার মানতে হয়েছে মুখ্যত লেগ-স্পিনার বব হল্যাণ্ডের কাছে। প্রথম টেস্টে ব্যর্থতার পর দীর্ঘদিন বাদে টেস্ট আসরে এসে তিনি যে এভাবে অস্ট্রেলিয়াকে জয়লাভে সাহায্য করবেন, সেটা কিন্তু কোথাও কোনও অতিবড় ক্রিকেট-অনুরাগীও ভাবতে পারেননি। বব পঞ্চম টেস্টের দুটি ইনিংসে উইকেট পেয়েছেন মোট দশটি। ববের সঙ্গে আরও একজনের নাম বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। কেপলার ওয়েসেলসের ১৭৩ রান দলকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করাতে পেরেছিল।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের অধিনায়ক লয়েডের এটাই ছিল শেষ টেস্ট। ব্রাডম্যান তাঁর শেষ টেস্টে কোনো রান করতে পারেননি। লয়েড অবশ্য পেরেছেন। কঠিন মনোবল নিয়ে তিনি লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন শেষ পর্যন্ত। ৭২ রান করে তিনি যখন প্যাভিলিয়নে ফিরছেন, মাঠে উপস্থিত দর্শকরা তখন তাঁকে বিপুলভাবে অভিনন্দন জানান। টেস্ট ক্রিকেটে পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে লয়েডকে বিদায় নিতে হলেও এটা বলতেই হয় যে, ফ্রাঙ্ক ওরেলের পর লয়েডই হচ্ছেন সবচেয়ে সফল অধিনায়ক। ওরেলের চেয়ে লয়েড অবশ্য ব্যাটসম্যান হিসেবে বেশি সফল। মোট একশো দশটি টেস্টের ১৭৫টি ইনিংসে লয়েডের মোট রান-সংখ্যা হচ্ছে সাত হাজার পাঁচশো সতেরো। শতরানের সংখ্যা হচ্ছে উনিশটি। ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান ভারতের বিরুদ্ধে, ১৯৭৪-৭৫ সালে বোম্বে টেস্টের ২৪২।

লয়েড বিদায় নিলেন। তিনি যেভাবে দল পরিচালনা করেছেন, সেইভাবে পরবর্তী দলনায়করা দল পরিচালনা করতে পারবেন কি না, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

বাংলার ক্রিকেটে বিসর্জনের বাজনা

অশোক রায়

কথা হচ্ছিল বাংলার এক প্রাক্তন ক্রিকেটারের সঙ্গে। ময়দানেই দেখা। দু-ভাঁড় 'আদা-চা' হাতে নিয়ে কুশল বিনিময় শেষ করার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের আলোচনা ক্রিকেটমুখী হয়ে পড়ল। এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা এসে পড়লাম রঞ্জি ট্রফিতে বাংলার সাম্প্রতিক ব্যর্থতার কাহিনীতে।

সেই কবে ১৯৩৮-৩৯ সালে লংফিল্ডের ক্যাপ্টেনশিপে মাত্র একবার জাতীয় ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল বাংলা। সেই একবার। তারপর গত পঁয়তাল্লিশ বছরে শিকে ছেঁড়ার মতো ঘটনা বাংলার ক্রিকেটে আর ঘটেনি।

তবু মেনে নিতে হবে, কার্তিক বসু, গণেশ বসু, কমল ভট্টাচার্য, পঙ্কজ রায়, খোকন সেন, পুঁটু চৌধুরী, মণ্টু ব্যানার্জি, প্রেমাংশু চ্যাটার্জি, শ্যামসুন্দর মিত্রের মধ্যে বাংলার ক্রিকেটের ঝক্‌ঝকে অস্তিত্বটুকু ছিল। ওই নামগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেক উজ্জ্বল ক্রিকেট মুহূর্ত। এখনও বাংলার ক্রিকেট বলতে আমরা ওই সব মানুষের কীর্তি-কাহিনীকেই স্মরণ করি। ক্ষীয়মাণ

কার্তিক বসু

সুব্রত গুহ

ধারাটি সুব্রত গুহ, অম্বর রায়দের সময়েও বাংলার বুকে তিরতির করে কিছুদিন বয়েছিল। কিন্তু তারপরের ইতিহাস শুধুই অন্ধকারের।

এই প্রথম বাংলা রঞ্জি ট্রফির গ্রুপ লিগে আসাম, ওড়িশা, বিহারের বাধা টপকে শেষপর্যন্ত নক আউট পর্যায়ে যেতে পারল না। পূর্বাঞ্চলের এই

পঙ্কজ রায়

দুর্বলতম রাজ্যগুলোর বিরুদ্ধেও বাংলা ব্যর্থ হল, শুধু এই তথ্যটাই বাংলার ক্রিকেটপ্রেমীদের মাথা ধুলোয় লুটিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। বললাম, "আপনার কী মনে হয়? ট্যালেন্টের অভাব?"

ভদ্রলোক বললেন, "আসল অভাব আত্মনিয়োগের। ময়দানের চারপাশে তাকিয়ে দেখুন বিভিন্ন ক্লাবের ছেলেরা নেট্ প্র্যাকটিস করছে। এরা সাজে পোশাকে ফিট্‌ফাট, অধিকাংশই দেখুন টেস্ট ক্রিকেটারদের মতো ট্র্যাক-সুট পরেছে। কিন্তু একটু লক্ষ করলেই বুঝবেন, শেখার তেমন আগ্রহ এদের নেই। এদের সমস্ত আয়োজনটাই একটা মস্ত ফাঁকি। এরা কোনোরকমে ক্রিকেট খেলে একটা চাকরি যোগাড় করতে পারাকেই চূড়ান্ত বলে ভাবে। এদের কোনো উচ্চাশা নেই, এরা স্বপ্ন দেখে না।"

বাধা না দিলে ভদ্রলোক হয়তো আরও বলে যেতেন। বললাম, "কিন্তু সব দোষটুকুই কি ক্রিকেটারদের?"

ভদ্রলোক বললেন, "দোষ শুধু ক্রিকেটারদেরই নয়, দোষ এই সিস্টেমটার। লিমিটেড ওভারের ক্লাব-ম্যাচ খেললে আর যাই হোক 'বিগ ম্যাচ টেম্পারামেণ্ট' কখনও তৈরি হয় না, বুঝলেন? ছোট্ট ছোট্ট মাঠে সাব-স্ট্যাণ্ডার্ড বোলিংয়ের বিরুদ্ধে পটাপট কিছু রান করার পরে যখন আসল পরীক্ষা দিতে হয় বড় মাঠে, উঁচু মানের বোলিংয়ের বিরুদ্ধে, তখনই ধরা পড়ে যায় আমাদের ক্রিকেটারদের আসল চেহারাটা।"

এরপর একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ভদ্রলোক। বললন, "কিছুই হবে না, কারুর হুঁশই নেই এই ব্যাপারে!" মাত্র এই দুটি কথা বলে চায়ের ভাঁড়ে শেষ চুমুক দিয়ে প্রাক্তন ক্রিকেটারটি ছুঁড়ে ফেললেন হাতের ভাঁড়টি। ছোঁড়ার ভঙ্গিতে স্পষ্টতই রয়ে গেল অনেকখানি ক্ষোভ, হতাশা আর দুঃখের চিহ্ন।

“নিজের দেশে তৈরি সবচেয়ে কম দামে ২-ব্যাণ্ডের কেলট্রন কমলই আমার পছন্দ। বলুন তো কেন?”

“খুবই সহজ, কেলট্রন কমল দুইভাবে টাকা সাশ্রয় করে।”

“এখনকার দিনে আর সবার মত আমারও তো দরকার টাকা সাশ্রয় করা। ঠিক এই তাগিদেই আমি ঘরে আনি ২ ব্যাণ্ডের কেলট্রন কমল।

প্রথমতঃ, আমাদের দেশেই প্রস্তুত বলে খরচের বোঝা অনেক হাল্কা। তাছাড়া কেলট্রন কমল সব থেকে কম দামী ২ ব্যাণ্ডের রেডিও।

দ্বিতীয়তঃ, কেনার পর দীর্ঘদিন কোন মেরামতির দরকার হয়না যেহেতু কেলট্রনের আপন গুণমানে তৈরী ডিরেক্ট ড্রাইভ টিউনার সত্যিই নিখুঁত।

মৃদু স্পর্শেই ঝকমকে নবগুলি আপনাকে নিয়ে যাবে পৃথিবীর এক স্থান থেকে আরেক স্থানে—
আকাশবানী, বিবিধভারতী, রেডিও সিলোন, বিবিসি, ভি ও এ . . .

তাহলেই বুঝুন কেন আমি সরাসরি কেলট্রন কমল কেনার পক্ষপাতী ছিলাম। একথা তো সত্যি যে একটা পয়সা সাশ্রয় করা মানে একটা পয়সা লাভ করা।”

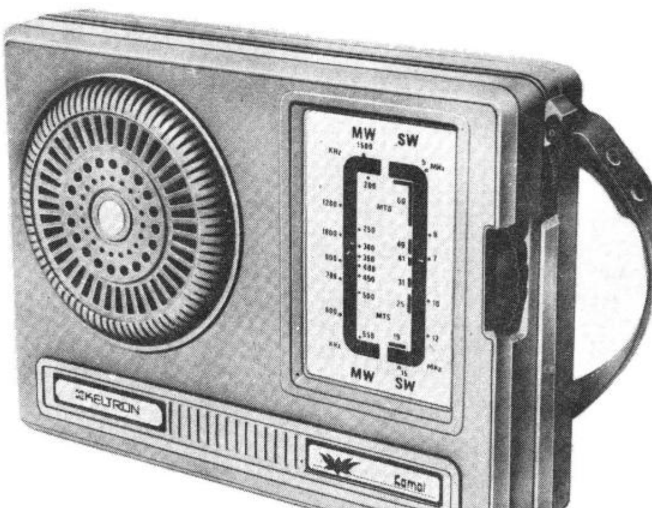

ক্রান্তি, কবিতা, কাঞ্চন, কামিনী, কিরণ, চিনার, কল্পকার মত রেডিও যেমন আছে তেমন আছে ক্লক রেডিও। কেলট্রনের এই সব অবদানের কেন এত খ্যাতি—কারণ প্রত্যেকটাই দামে কম অথচ কাজে নিখুঁত।

আর এ সবেরই পিছনে আছে বিশ্বস্ত কেলট্রনের গ্যারান্টি।

নীচুমানের অন্য কিছুর কথা একেবারেই মাথায় আনবেন না। রেডিও কিনতে হলে কেলট্রনই কিনুন।

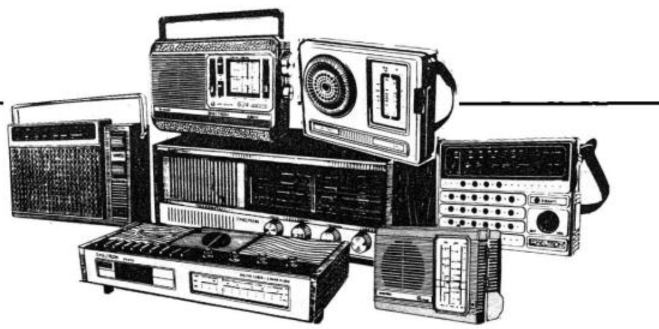

KELTRON
know-how to serve the people.

কেরালা স্টেট ইলেকট্রনিকস্
ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড
কনজ্যুমার ইলেকট্রনিকস্ ডিভিশন
সাস্হমঙগলম, ত্রিবান্দ্রম-৬৯৫০১০
ফোন : ৬৩১০৬

FDS/KE/314-C

কলকাতার ব্রাঞ্চ অফিস—৭৫ সি পার্ক স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১৬ ফোন : ২৪-৫৬৫৪, ২৪-৯০৭৯।

ANANDAMELA 23 JANUARY, 1985. Regd. No. WB/CC/264. MH-By-SOUTH 683TN/MS(C) 731

ক্যাডবেরিস্ ড্রিঙ্কিং চকোলেট করেছে আয়োজন, শীতে উষ্ণ-মধুরতায় ভরাবে সবার শরীর-মন

চকোলেট সিজ্‌ল !

এক কাপ ফুটন্ত গরম দুধে তিন চা-চামচ ক্যাডবেরিস্ ড্রিঙ্কিং চকোলেট মেশান আর সবাইকে খাওয়ান—ধোঁয়া ওঠা চকোলেট সিজল কনকনে শীতে, শরীরকে চাঙ্গা রাখার এক মধুর উপায় !

চকোলেট সুঅর্ল !

বেশ খানিকটা গরম দুধে তিন চা-চামচা ক্যাডবেরিস্ ড্রিঙ্কিং চকোলেট মিশিয়ে দিন—ওপর থেকে দিন মধু ছড়িয়ে ! এ এক মধুর চকোলেট সুঅর্ল শীতের দিনের সাদর-আহ্বান, ভরিয়ে তোলে উষ্ণতায় দেহ-মন-প্রাণ ।

চকোলেট নাটি !

গরম ধোঁয়া ওঠা এক কাপ দুধে তিন চা-চামচ ক্যাডবেরিস্ ড্রিঙ্কিং চকোলেট মিশিয়ে দিন। কুচো-বাদাম ছড়িয়ে দিন ওপরে ! চমৎকার চকোলেট নাটি ! উষ্ণ-মধুর চকোলেট মজাদার—ঘরের পানে টানে বারবার !

চকোলেট স্পাইস !

একমগ গরম দুধে তিন চা-চামচ ক্যাডবেরিস্ ড্রিঙ্কিং চকোলেট দিন মিশিয়ে ! দারুচিনি, জায়ফল ও এলাচগুঁড়ো মিশিয়ে নেড়ে দিন—এ এক তাক্ লাগানো চকোলেট স্পাইস ! শীতের দিনে দেহ-মনে এনে দেয় উষ্ণতার অনুরণন !

ক্যাডবেরিস্ ড্রিঙ্কিং চকোলেট ২০০ গ্রামের টিনেও পাওয়া যায়!

OBM/3323 BEN